বিষ বহ্নি বাসনা

ধীরেন হোম

এম সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রদ্ধেয়

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে

এই লেখকেরই :

বধির রুদ্র,

কাঁটা তারের খাঁচা,

So Many, So Gallant,

Floods Along the Ganges,

Poison and Passion,

Hungry Hearts.

প্রথম পরিচ্ছেদ

। এক ॥

চলতি শতাব্দীর মাঝামাঝি এক বিকেল। বোম্বেতে। আঠাশ-উনত্রিশ বছর বয়স্ক আইবুড়ো প্রবীর পুরকায়স্থ নিজেকে একটু ফিটফাট করে নিচ্ছে। অফিসে, কাজ সেরে বেরনোর আগে। বেজে ওঠে টেলিফোন। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তোলেই সে হেসে ওঠে। হ্যাঁ, বেরুতেই যাচ্ছিলাম। আর এক মিনিট দেরী হলেই আজকের মত গায়েব হয়ে যেতাম। আচ্ছা বল্, কি খবর? কি? কাফে মেরীনাতে চা খেতে ডাকছিস্? জবরদস্ত কোন মামলা জিতেছিস্ না কি? না! তবে? না না, জেরা কচ্ছি না। হঠাৎ কাফে মেরীনার মত নাক উঁচু রেস্তোরাঁতে জলযোগ করাতে ডাকছিস তো? উপলক্ষ সম্বন্ধে সাধারণ একটু ঔৎসুক্য। না না, আমি মোটেই অনুৎসাহী নই। না না, হাতে অন্য কোন কাজও নেই। চলে আসছি। কতক্ষণ লাগবে? এই মিনিট পনেরো। যদি ট্যাক্সি পেয়ে যাই তো আরো আগে। আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি।

কিন্তু রিসিভার নামাতে নামাতে প্রবীরের মুখে চিন্তা-ছায়া। তার হাতে সত্যিই অন্য কোন কাজ ছিল না। কিন্তু কিছুদিন যাবত এ সময়ে বিশেষ একটা রেস্তোরাঁতে ছুটে যেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সে। চা-জলখাবারের টানে নয়।

এ সময় ওখানে গেলে একটি চটুল এবং ঝলমলে মেয়ের সঙ্গে দেখা যায়। নির্ঘাত। চা-জলযোগ এবং গল্পগুজব করতে করতে ঘন্টা দেড় ঘন্টা কেটে যায়। কোন কোন উপলক্ষে একত্রে একটু ঘুরে বেড়ানোও হয়। ভাল লাগে।

ব্যাপার আসলে তেমন কিছুই না। এ সময় সে ওখানে যায়, মেয়েটিও আসে—একটু আগে কিম্বা পরে। এই যে, তুমিও এসে গেছ দেখছি, বা এই ধরণের কিছু বলেটলে যে পরে আসে সে যে আগেই এসে গিয়েছিল তার সঙ্গে ভিড়ে যায়। তবে দৈবাৎ দুজনের কারো সঙ্গে অন্য কেউ থাকলে, তৃতীয় পক্ষটিকে কনুই ঠেলায় সরিয়ে দেওয়া হয়। সৌজন্য-স্নিগ্ধ বাক-নৈপুণ্যের দৌলতে আপত্তিকর উপলক্ষ না ঘটিয়ে।

তারা দুজনের মধ্যে আলাপ-সালাপ জমেও খুব। দুজনেই সংবাদিক। প্রবীর "দ্যা অ্যারিনা" নামক এক সামরিক মেজাজের লোকপ্রিয় ইংরাজী বৈকালিক পত্রিকার সহ-সম্পাদক। মেয়েটি নবিস, কিন্তু প্রতিযোগীতা বিজয়ী। "ভারত সমাচার" নামক অন্য একটা ডাকসাইটে ইংরেজী দৈনিকে সমাজ-কলম লেখে। মেয়েটির মনের খবর ধরা শক্ত। কিন্তু প্রবীরের কৌমার্য-বন্দি যৌবন চাঞ্চল্য সাহচর্য-তৃপ্ত হয়।

সেদিন সেটা বাতিল করা প্রয়োজন হয়ে ওঠায় প্রবীরের মন মোচড় খায়, বিকেলটা হৃত-মাধুর্য ঠেকে। কিন্তু মেরীনাতে যাব বলে না যাওয়াও অসম্ভব। সেখানে তাকে যেতে ডেকেছে কানুভাই জরিওয়ালা। বোম্বেতে প্রবীরের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট বন্ধু। ইয়ার।

॥ দুই ॥

মেরীনাতে প্রবীরকে দেখেই কানু বলে, তুই যে দেখছি সত্যি সত্যিই পনেরো মিনিটের মধ্যে চলে এসেছিস্। আমি ধরে নিয়েছিলাম আসবার পথে অজন্তাতে একটা ঢুঁ মেরে আসবি।

প্রবীর ভুরু কুঁচকোয়। অজন্তা ঐ বিশেষ রেস্তোরাঁটার নাম। তোকে এখানে অপেক্ষায় রেখে আমি অজন্তায় ঢুঁ মারতে যাব ভাবতে গেলি কেন?

শিপ্রা সাতুস্কর যে ওখানে মজুদ এখন।

প্রবীরের বুকটা ধক্ করে ওঠে। শিপ্রা সাতুস্কর সেই সহ-সংবাদিকাটির নাম। তোর আজ হলো কি, বলতো? শিপ্রা সাতুস্করের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?

সে তুই জানিস। আমাকে তো কিছু বলে রাখিস্ নি?

যাঃ, আবোল-তাবোল বকিস নে।

আমি আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছি? তুই আর শিপ্রা অজন্তায় রোজ বিকেলে চা খেতে যেয়ে খুনসুটি করিস না?

ও, এই কথা! তা অজন্তার মতো রেস্তোরাঁতে গেলে জানাশোনা কারো না কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

আর সেই দেখা হয়ে যাওয়া মানুষটি কেউ-না-কেউ না হয়ে নির্দিষ্ট একজন কেউ হতে থাকলে? রোজ?

তার কারণ শিপ্রাও সাংবাদিক।

কানু হাসে। অদ্ভুত সে হাসি। নিরাওয়াজ, কিন্তু অর্থবহ। একটা ছেলেমানুষী ধূর্তামীতে তার মুখ চোখ চকমক করতে থাকে, অপর পক্ষের অস্বস্তি লাগে। চাল ফস্কে যাবার অস্বস্তি। ছাখ্ প্রবীর, হাসি-আক্রমণ থামিয়ে কানু বলে, তুই শিপ্রার কবলে পড়তে যাসনে। ওর সঙ্গে তুই পেরে উঠবিনে!

আরে ঃ, তুই যে আমাকে উপদেশ দিতে লেগে গেলি!

উপদেশ দিচ্ছিনে, সতর্ক করে দিতে চাচ্ছি। জানিস্, ও বিবাহিত?

জানি।

জানিস্!

হ্যাঁ। প্রেমে পড়ে বিয়ে করা স্বামীর সঙ্গে ওর বনিবনা হচ্ছে না, ও এখন আলাদা থাকে, বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য চেষ্টা হচ্ছে। ইত্যাদি। দেখলি? সব জানি।

আর সমস্ত জেনেশুনেও তুই ওর পেছনে ঘুরছিস্! কেন রে?

ওকে ভাল লাগে যে।

আমার কথা শোন। ওকে অনেকেরই ভাল লাগে। কিন্তু কাকে যে ওর ভাল লাগে, কেউ জানে না। প্রত্যেকেই ভাবে তাকেই শুধু ওর ভাল লাগে। তুই ওদের ভিড় বাড়াতে যাসনে। ফিরে আয়।

ছাখ কানু, আমি কচি ছেলে নই। আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিস্ ভাল

করেছিস্। আমি সে জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ ব্যাপারে তুই আমাকে আর কিছু বলতে যাবি নে। কোনদিন কোন কারণেই না। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

তবে যা, গোল্লায় যা। কিন্তু যখন বেগতিক হবি, আমাকে মনে করিস্। আমি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে যাব না। আচ্ছা, এখন বল্ কি খাওয়া যায়। চীজ-টোষ্ট ?

শিপ্রার প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে যাওয়ায় প্রবীর আরাম পায়। বলে, মেরীনাতে এসে চীজ-টোষ্ট না খাওয়ার মানে হয় ? আর আজকের ওকালতি যদি বার লাইব্রেরীতে বসে স্রেফ মাছি মারা না হয়ে থাকে তো চিকেন পেটিজও হয়ে যাক্। মেরীনা তো দুটোর জন্যেই প্রসিদ্ধ।

॥ তিন ॥

চীজ-টোষ্ট এবং চিকেন পেটিজ খেতে খেতে দু বন্ধুর মধ্যে গল্প গুজব খুব জমে ওঠে। বিতর্ক-ধর্মী গল্প গুজব। শিপ্রা প্রসঙ্গে যার একটা নমুনা দেখা গেল।

তাদেব বন্ধুত্ব জন্মেছিল সাত-আট বছর আগে। কানু তখন ছাত্র। প্রবীর জুনিয়ার রিপোর্টার। জানাশোনা হয়েছিল ছাত্র-আন্দোলনেব মাধ্যমে একটা সদ্য স্থাপিত বিপ্লবপন্থী ছাত্র সঙ্ঘের সেক্রেটারী ছিল কানু। তাকে শহরের পত্র-পত্রিকাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হতো। প্রবীরের সঙ্গে তার দেখা সেই সূত্রেই। দুজনেই সমবয়েসী। প্রবীর রাজনীতি করে না। অন্ততঃ সরাসরি না। কিন্তু সে অত্যন্ত রাজনীতি-সচেতন, রাজনীতি সম্পর্কে তার ঔৎসুক্যও অফুরন্ত। কানুকে সে টেনে ধরে। অচিরেই তাদের বন্ধুত্ব অচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের মধ্যে মতের মিল দেখা যেতো কদাচিৎ, রুচি পছন্দ-অপছন্দ কিম্বা মন-মেজাজে অমিল কখনো না। তাদের মেয়ে-উৎসাহও সমান ছিল।

কানু রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিল ছাত্রজীবনেই। ল-পাস করে এম এ পড়বার সময়ই রোজগার করতে নামতে হওয়ায়। এখন সে আইনজীবি। কিন্তু

প্রবীরের সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট, দৃঢ়তর।

খোশ গল্পের এক ফাঁকে কানু আচমকা বলে, তুই তো তোর ওই ফরাসী মহিলার গেষ্ট-হাউসে অনেকদিন আছিস্। সুখে আছিস ?

সুখটুক বুঝি না। অফিসের কাছাকাছি। তার ওপর আবার সাহেব পাড়া। চলে যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ ও প্রশ্ন কেন ?

তোর ইচ্ছে হলে আমার ফ্ল্যাটে চলে আসতে পারিস্। বছর দুই থাকতে পাবি। হয়তো আরো বেশী।

তোর ফ্ল্যাটে! নিরু আপত্তি করবে না ?

নিরু কানুর প্রেমে পড়ে বিয়ে করা স্ত্রী।

নিরু আমেরিকা চলে গেছে।

আমেরিকা চলে গেছে! কেন ? কবে ?

গেছে পড়তে। আজ দু-তিন দিন হলো।

প্রবীর নির্বাক, বিস্ময়-বিহ্বল।

নির্বাক এবং বিস্ময়-বিহ্বল হবারই কথা। কানু আর নিরুর বিয়ে ছিল অবোধ্য মদন-মহিমা, বিঘ্নবহুল প্রেমের অকল্পিত ফলশ্রুতি। এ বিয়ে হবে বলে কেউ কোনদিন ভাবেনি। মনের মিল ছাড়া আর কোন কিছুই তাদের অনুকূলে ছিল না। নিরুরা নাগর ব্রাহ্মণ, গুজরাটে যারা কুলীন শ্রেষ্ঠ; কানুরা বৈশ্য—বোম্বেতে যারা বানিয়া বলে খ্যাত। নিরুর বাবা গোবর্ধনভাই যাজ্ঞিক ক্রোড়পতি শিল্প-বাণিজ্যাধীশ; কানুর বাবা কান্তিভাই জরিওয়ালা একটা বিদেশী সওদাগরী অফিসে হেড ক্লার্ক। নিরু অপরূপ সুন্দরী; কানু লম্বা-চওড়া এবং পুরুষত্ব-প্রখর, কিন্তু এক পায়ে খোঁড়া। নিরু মা-বাবার একমাত্র সন্তান—আদুরে; কানু সাত-আট ভাই বোনের মধ্যে একটি, ছন্নছাড়াও। নিরুর বাবা এ বিয়ে হতে না দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন; কানুর বাবা ছিলেন আগ্রহব্যাকুল কিন্তু এক অপূরণীয় শর্তে—নগদ এবং অলঙ্কারাদিতে মোটা যৌতুক।

দু পক্ষেরই গোঁ ব্যর্থ করে দেয় প্রেমিক-প্রেমিকারা। দুজনই তখন স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র। তারা চাকরী বাগিয়ে নিয়ে আইনমতে বিয়ে করে ফেলে খবরটা সংশ্লিষ্ট মহলে পৌঁছিয়ে দেয় সংবাদপত্র মারফত। সন্তানবহুল কান্তিভাই জরি-ওয়ালা ছন্নছাড়া ছেলেটার কাণ্ড দেখে রেগে আগুন। ওর আর মুখই দেখবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেন। কিন্তু নিরু তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তাঁরা হা-হুতাশ এবং গালাগাল যা করার করে টরে মেয়ে-জামাইকে বরণ করে নেন।

কান্তিভাই জরিওয়ালারও রাগ পড়ে যায় এবং কানুর মুখ না দেখার প্রতিজ্ঞাটাও আর মনে থাকে না। একজন ক্রোড়পতির একমাত্র সন্তানের সঙ্গে ছেলের বিয়েতে যে যৌতুক আশা করা তিনি ন্যায্য মনে করেছিলেন, শেষপর্যন্ত তার চেয়ে অনেক বেশী ঘরে আসে।

নগদ এবং অলঙ্কারাদি ছাড়া মেয়ে জামাইকে একটা সুন্দর ফ্ল্যাটও দেন গোবর্ধনভাই। প্রবীরকে কানু এখন সহ-অধিবাসী হতে ডাকে সেখানেই। বিয়ের পর মাস দু-তিনেকের মধ্যে।

॥ চার

প্রবীর নতুন আস্তানায় চলে যায় পরদিন সকালেই। বাসা বদলের ঝকমারি মেটাতে মেটাতে অবেলা হয়ে যায়। আগের দিন বিকেলে অজন্তায় যাওয়া হয়নি। সেখানে ছুটে যাবার জন্যে মন তার অস্থির হয়। কিন্তু ওখানে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হতে তার মাথায় আসে এক ফন্দি। আরো একটা দিন দুজনের মধ্যে দেখা না ঘটিয়ে তার প্রতি শিপ্রার মনোভাবটা একটু যাচাই করে দেখার। সে চলে যায় সিনেমায়।

ফল হয় আশাতীত। তৃতীয় দিন অফিস যাবার আধঘন্টার মধ্যেই তাকে ফোন করে শিপ্রা। আজকাল খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে, শিপ্রা বলে।

শিপ্রার স্বর চেনা মাত্রই প্রবীরের মন এক অনাস্বাদিত প্রাপ্তি-প্রসাদে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় সে বাড়ি বদলের খবরটা দিয়ে দুদিন নিখোঁজ থাকার কারণটা ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিল। সখেদে। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তার্ধে তার মাথায় জন্মায় কান্দর্পিক তৎপরতা। স্বরে প্রাত্যহিকতা শীতল বিস্ময় ফুটিয়ে সে জবাব দেয়, কেন বল তো? ও, অজন্তায় দুদিন আসিনি কেন? আর বলো না, এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলুম। না, মেয়ে বন্ধু নয়, ছেলে বন্ধু-ই। প্রবীর বাড়ি বদলের খবরটা চেপে যায়। দুদিন অজন্তায় না যাওয়ার কারণটা হাল্কা দেখানোটা তার কাছে শ্রেয় মনে হয়। তারপর তোমার খবর কি?

আমার খবর নেবার কে আছে?

কেন? এই তো আমি নিচ্ছি।

আ-হা-হা! আমার জন্যে মানুষের কত দরদ! নিজে থেকে ফোন করলাম তবে না আমার খবর নেবার কথা মনে পড়ল।

তা যদি মনে করে থাক, ভুল করেছ। আজ আমিই তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।

শিপ্রা হাসে। মিথ্যুক। আচ্ছা, ও-কথা এখন ছাড়। আজ অজন্তায় আসছ তো? না আরো কোন বন্ধুর পাল্লায় পড়ার ফিকিরে আছ?

প্রবীরের কান্দর্পিক তৎপরতা এখন সাহস সমর্থিত। আজ বিকেলে একটা সিনেমা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। মিতালিতে। ওখানে একটা ভাল ইংরেজী বই চলছে। যদি তোমাকেও আসতে বলি?

বলেই দেখ না?

বলছি, আসবে?

শিপ্রা খিল খিল করে হাসে। দিন দিন সাহস খুব বেড়ে যাচ্ছে, না? কিন্তু বন্ধু তো মানুষের অনেক! আমার দিকে এই পক্ষপাতিত্ব কেন?

টানে।

টান যে কত তা যেন আর দুদিন ধরে দেখা যায় নি?

মেয়েদের এই দোষ। কোন একটা কথা একবার মাথায় ঢোকে গেলে সেটা সেইখানে আটকে থাকে।

মেয়েদের সম্বন্ধে জ্ঞান যে খুব টনটনে! হলো কি করে? বই পড়ে নয় নিশ্চয়?

এই বাক-খোঁচার পাল্টা জবাবটা দিতে যেয়ে প্রবীর গম্ভীর হয়ে যায়। অভিনয় করে নয়, আবেগসিক্ত হয়ে ওঠে। জীবনে কতকগুলো জ্ঞান আছে যা শিখতে হয় না, আপনা-আপনি হয়।

সেটা লক্ষ্য করেই হয়তো শিপ্রাও কথা বলার ধরন পাল্টে ফেলে। সংলাপ-প্রসঙ্গও বদলে যায়। কর্মব্যস্ত কলম-লিখিয়ের ভাবভঙ্গি ফুটিয়ে সে বলে, শোন, বকাবকি অনেক হয়েছে। আমার অফিসে যাবার সময়ও পেরিয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে ফোন করছি? এটাও আন্দাজ করতে পারছ না? পাব্লিক বুথ থেকে। না না, অফিসের কাছেই। আচ্ছা এবার ছেড়ে দিচ্ছি। বিকেলে সিনেমায় যদি না যাও, অজন্তায় চলে এসো।

তার মানে আমার সিনেমা দেখার নিমন্ত্রণটা নাকচই হয়ে গেল?

আজ নয়, অন্য কোন দিন।

যদি কাল আসতে বলি ?

আসব, তবে ম্যাটিনীতে। সাড়ে ছ-টার শোতে গেলে বাড়ি ফিরতে বড্ড দেরী হয়ে যাবে।

তাহলে ম্যাটিনী শোর জন্যেই নিমন্ত্রণ রইল। না, অজন্তাতে আজ আর আসছি না। মিতালীতে বইটার আজই শেষ দিন। ওখানে যাব।

বড্ড একগুঁয়ে তুমি। আচ্ছা, তাহলে আমিও চলেই আসব। তুমি ঠিক সময়ে চলে এসো কিন্তু। সিনেমা হলের সামনে একা দাঁড়িয়ে থাকতে আমার বড্ড বিশ্রী লাগে।

কিন্তু একত্রে সিনেমা দেখা সেদিন হয় না তাদের। প্রবীরই অ্যাপয়েন্টম্যান্ট রাখতে পারে না। জরুরী কাজ পড়ে যাওয়ায়।

॥ পাঁচ ॥

কানুর যৌতুকে পাওয়া ফ্ল্যাটটা খার নামক এক মধ্যবিত্ত-শ্রেণী-প্রধান শহরতলীতে। ওখানেই একসময় তার শ্বশুর পরিবার থাকতো। ভাড়ায় খাটানোর জন্য পুরানো ভিটেতে নতুন তৈরী বাড়ীটার নাম রাখা হয়েছিল স্মৃতি-নিকেতন। স্মৃতিকে বিজ্ঞপ্তি উজ্জ্বল রাখার মতোই বাড়ি। স্থাপত্য এবং অন্তর্বিন্যাসে। তবু যৌতুকে দেওয়া ফ্ল্যাটটার পুনর্গঠন করা হয়েছিল অনেক। শ্রী এবং আয়তন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। সময় এবং শ্রম সংক্ষেপনী সুবিধাগুলোও অত্যাধুনিক করে ওটাকে ভাড়ায় খাটছিল অংশটা থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়। আলাদা ফটক এবং বাগানশোভিত চৌহদ্দির বৃহদাংশ সহ। স্মৃতি-নিকেতন বলতে মানুষ এখন এ অংশটাকেই বোঝে। ফ্ল্যাটের পাঁচ-পাঁচটা ঘরের যেটা প্রবীরকে দেওয়া হয়েছিল সেটা যেমন প্রশস্ত এবং সুবিন্যস্ত, তেমনি নিরালা আশ্রিত। বিস্তীর্ণ মাঠ এবং তাল-নারকেল গাছে ছাওয়া জুহুর সমুদ্র সৈকত ছিল ওটার গবাক্ষ দৃশ্যের বিশেষ অংশ। থাকবার এমন একটা সুব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় প্রবীর খুব সুখী।

ওখানে যাবার মাস দেড়েক বাদে এক শনিবার সন্ধ্যায় কাজ এবং প্রণয়বাজি সেরে ফেরার পথে বাড়ির গেটে এসেই প্রবীর আমোদ আকাঙ্খায় নতুন করে সজীব হয়ে ওঠে ভেতরে কোলাহল মুখর আড্ডা জমার শাব্দিক সঙ্কেত পেয়ে।

স্মৃতি-নিকেতনে থাকতে আসার পর যে জিনিসটা সে সর্বাপেক্ষা বেশী পছন্দ করেছিল সেটা এই আড্ডা। কানু ছিল ভীষণ আড্ডাবাজ এবং সঙ্গীপ্রিয়। তার বন্ধুবান্ধব ছিল যেমন অগুণতি তেমনি রকমারী। আর ওদের সবাই ছিল আমোদ-উন্মাদ। রাত্রির প্রথম প্রহরার্ধ তারা আড্ডা মেরে না কাটিয়ে পারতো না। সবাই সব রাত্রেই এক জায়গায় জড় হতো না। জটলাস্থলটা হতো সুবিধা-নির্ণিত। কিন্তু কানুর আড্ডাবাজি ছিল গৃহকেন্দ্রিক। তার ফ্ল্যাটে ছোট কিংবা বড় আড্ডা জমতো প্রায় রোজই। শনিবার সন্ধ্যায় নির্ঘাত।

প্রবীর নিজে কিন্তু নিভৃতি-বিলাসী। কিন্তু স্মৃতি-নিকেতনে যারা আড্ডা জমাতে আসতো তারা প্রায় সবাই প্রবীরেরও বন্ধুবান্ধব, তাদের আমোদ-উন্মত্ততা সংক্রামক।

চেঁচামেচি থেকে কারা সব এসে জড় হয়েছে চিনতে চিনতে প্রবীর এসে দাঁড়ায় দরজায়। সঙ্গে সঙ্গে একজন অতিথি তারস্বরে এবং এক হাত মাথার ওপর তোলে বুলি ছাড়ে:—ওয়ান চিয়ার ফর দ্য লেট্-কামার। পরবর্তি দৃশ্যমালা অকল্পনীয়। বৃহদাংশ অতিথিদের সমস্বরে উচ্চারিত হুরা-ধ্বনি শেষ হবার আগেই দুজন ছুটে এসে প্রবীরকে কাঁধে তুলে নেয়। অন্য কয়েকজন মিলে একটা পাশ্চাত্য গৃহ-প্রত্যাবর্তন সঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করে। গলা ছেড়ে, সোত্মমে, স্বরলিপিতে হৃদয়-বিদারক কাটছাঁট ঘটিয়ে। সর্বশেষে ওঠে হাসির রোল। ছাদ ফাটিয়ে।

এই আমোদ-পাগলদের কেউই কিন্তু অকাল-কুষ্মাণ্ড ছিল না। প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষিত কিংবা উচ্চাশিক্ষাধীন, অনেকেই কোন না কোন বিশেষ গুণে গুণান্বিত। কবি, প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক, নাটক রচয়িতা, নাচিয়ে গাইয়ে, চিত্রশিল্পী, সৌখীন অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্মীর দেখা পাওয়া যেতো এদের মধ্যে।

এদের যোগসূত্রও ছিল আমোদ-উন্মত্ততা নয়, মুক্তি বাসনা। সক্রিয়। এরা সবাই যুবক-যুবতী, সতের-আঠার থেকে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স-গণ্ডীভুক্ত। লাঠি-গুলি খাওয়া কিম্বা জেল-দ্বীপান্তর খেটে আসা মুক্তি-সংগ্রামী এদের মধ্যে অবশ্য বড় বেশী ছিল না। তথাপি জাতীয় সংগ্রামে এদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ঐ যুগে দেশের লিপি এবং কলাসাধকদের বৃহত্তর অংশের প্রত্যেকেই নিজ নিজ শিল্পের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামকে উন্মাদনা-মজবুত করতে চাইতো। এই ছেঁড়া-ছাড়া ব্যক্তিগত প্রয়াসকে সঙ্ঘবদ্ধ করা হয় এক সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে তোলে। এই আমোদ-পাগলারা সবাই এই সঙ্ঘের সদস্য কিংবা সমর্থক।

বিকেলে প্রবীর বাড়ি ফিরত একটু দেরীতে। সেদিন তার ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরই আসর ভাঙ্গার তাগিদ জাগে। চলে যাবার জন্য দু-একজন দাঁড়িয়েও যায়। এমন সময় ঘটে এক চমক ভাঙানো দৃশ্য।

বোম্বের আঞ্চলিকতা মুক্ত সমাজজীবনের জলজ্বলে উদাহরণ ছিল এই আমোদ-পাগল দেশ-প্রেমীর দল। কিন্তু সেদিন অতিথিদের সবাই ছিল ঐ সাংস্কৃতিক সংঙ্ঘের গুজরাটি শাখার সদস্য এবং সমর্থক। শহরতলীতে একটা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এসে এরা জমা হয়েছিল স্মৃতি-নিকেতনে। এই সর্ব-গুজরাটি দলেরও প্রায় সবাই ছিল ইংরেজী শিক্ষিত। অধিকাংশই প্রবীরের বন্ধু কিংবা আলাপিত। অপরিচিত অতিথিদের একটি ছিল বাইশ-তেইশ বছর বয়স্কা যুবতী। স্বল্পভাষী এবং আচরণ-সংযত, কিন্তু গ্রামীনতা মধুর যৌবন-সম্পদ হেতু আসরের মুখ্য আকর্ষণ বিন্দু। সে-ই এই চমক ভাঙানো ঘটনাটার স্রষ্টা। যে দুটি অতিথি চলে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাদের লক্ষ্য করে মেয়েটি কি একটা বলে। গুজরাটিতে। বক্তব্যটা প্রবীর বুঝতে পারে না। কিন্তু ওটা শোনামাত্রই যে অতিথিদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, সেটা সে দেখতে পায়। তার পাশেই যে অতিথিটি বসেছিল তাকে সে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে রে?

ঐ মেয়েটি আমাদের সংস্থা এবং সংস্রব থেকে সরে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

মেয়েটি কে?

তুই চিনবি নে। সম্প্রতি আমেদাবাদ থেকে এসেছে। খুব ভাল কর্মী।

বাক্-মাধ্যম এখন নির্জলা গুজরাটি। আলোচনা ও উত্তেজনা তপ্ত হয়ে উঠছিল। প্রবীর ভেতরে চলে যায় আধা সারা বেশ পরিবর্তনটা সেরে নিতে। আটপৌরে বেশে সে যখন বসার ঘরে ফিরে আসে তখন উত্তেজনাজনক প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেছে। আড্ডাও ভাঙ্গছে। বিদায়ী অনুষ্ঠান সমাপনার্থে সকলেই গেটে আবার জমা হয়। প্রবীরও। সেখানে সে আরো আশ্চর্যজনক ব্যাপার লক্ষ্য করে। অফিস থেকে বাড়ী ফেরার সময় সে গেটের কাছে একটা বিরাট গাড়ী দাঁড়ানো দেখেছিল। ওপরের ভদ্রলোকটি চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। প্রায় রাত্রেই ওখানে বড় বড় গাড়ীওয়ালাদের আসা যাওয়া হতো। প্রবীর এই গাড়ীটাকেও ওপরে আসা কারো হবে মনে করেছিল। এখন সে এই গাড়ীটার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে ঐ অচেনা মেয়েটিকে।

মেয়েটি কিন্তু গাড়িতে বসে চলে যায় না। তাকে এগোতে দেখে

একটি উর্দীপরা সোফার বেরিয়ে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়। দুজনের মধ্যে কি কি কথাবার্তা হয় প্রবীর বুঝতে পারে না। কিন্তু যথাসময়ে অতিথি-বিদায় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে দেখা যায় মেয়েটি থেকে গেছে। গাড়িটাও।

গেট থেকে ফেরার পথে কানু আর মেয়েটি কথা বলতে বলতে এগোতে থাকে। প্রবীর সিগারেট ধরানোর ছলে একটু পেছনে পড়ে যায়। কিন্তু ভেতরে তিনজন একত্র হওয়া মাত্রই কানু মাথা নেড়ে মেয়েটিকে দেখিয়ে বলে, ওর সঙ্গে তোর এখনো কথাবার্তা হয়নি, না? আয় তোদের পরিচয় করিয়ে দিই।

পরিচিতি অনুষ্ঠান ও চমক জাগায়। মেয়েটির নাম প্রভা শাহ। সেটা অবশ্য বৈশিষ্ট্য-বর্জিত। কিন্তু ওর মেসো বোম্বের একজন প্রসিদ্ধ বণিক মোগল। শান্তিভাই জাভেরী। স্মৃতি-নিকেতনের গেটে দাঁড়ানো বিরাট গাড়িটার যিনি মালিক।

পরিচিত হওয়ার পরও কিন্তু প্রবীরের সঙ্গে মেয়েটির কথাবার্তা হয় না। বস্তুতঃ সহাস্যে নমস্কার বিনিময় হওয়ার পর দুজনের মাঝে আবার জাগে মৌনতা শীতল দূরত্ব। অস্পষ্ট, কিন্তু অনুভূতিগ্রাহ্য।

এই পরিস্থিতিতে সেখানে আসে নতুন একজন অতিথি, উপস্থিতি প্রখর এবং কানু-প্রবীরের সমবয়েসী। তার পরনে পাজামা-পাঞ্জাবী-জহর-জ্যাকেট, কিন্তু উপস্থিতি-আবেদনে স্নিগ্ধ সাহেবীয়ানার সৌরভ।

নবাগতটিকে দেখেই প্রবীর স্মৃতি বিভ্রাটে পড়ে। তার কেবলি মনে হতে থাকে মানুষটি খুব পরিচিত, কিন্তু ভদ্রলোকটি কে এবং কোথায় কি উপলক্ষে তাদের দেখা হয়েছিল সে ভুলে গেছে। তার স্মৃতি-লাঞ্ছনা লক্ষ করে কানু সুরে একটা খোঁচা ফুটিয়ে বলে, এমন ফ্যালফ্যাল করে কি দেখছিস্? এরই নাম সুরেশ পেটেল।

প্রবীর চমকে ওঠে, অভ্যর্থনা ব্যাকুল হয়ে সুরেশের সঙ্গে হাত মিলাতে যায়। "ইট'স অ্যা থ্রিল, মিটিং ইউ, সুরেশভাই।"

"সেম হিয়ার, বাট্ কল মি সুরেশ অ্যাণ্ড কাউন্ট মি এজ ওয়ান অব ইয়র প্যালস্, প্রবীর। ওকিউ, প্লিজ?"

তারা দুজনে গললগ্ন হয়।

সুরেশ সে রাত স্মৃতি-নিকেতনেই থেকে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রভা ফিরে যাচ্ছিল তার মাসীর বাড়ীতে। খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনজনেই বেরিয়ে পড়ে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য। কিন্তু গাড়ি চলামাত্রই প্রবীর আবার পাশকাটা হয়ে যায়

অন্য তিনজন গুজরাটিতে কথা বলতে আরম্ভ করায়। এবারও সে কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু বাক্যালাপ যে উত্তেজনা-উষ্ণ হয়ে উঠছে সেটা লক্ষ্য করতে তার মুস্কিল হয় না। আরো একটা জিনিষ সুস্পষ্ট হয়। কথা কাটাকাটিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষ প্রভা আর সুরেশ, কানু মধ্যস্থতা প্রয়াসী।

প্রভার মাসীরা থাকতেন মালাবার হিলে। খার থেকে মাত্র সাত-আট মাইল দূরে। সোফার চালিত বিরাট গাড়িতে কয়েক মিনিটের রাস্তা। বিশেষ করে বাড়তি রাত্রের জনবিরলতায়। কিন্তু সেখানে এক ঘন্টায়ও পৌছানো হয় না। বচসা ক্রমে তীব্রতর হয়ে হয়ে উঠতে থাকায় গাড়ি মাঝপথে থামিয়ে নেওয়া হয়। শিবাজী পার্কে। খুব সম্ভব প্রবীরের কথা ভেবে। তাকে গাড়িতে অপেক্ষারত রেখে ওরা তিনজন নেমে গিয়ে মাঠে মুখোমুখি বসে আবার বচসা-বন্দি হয়।

ওরা নেমে যাওয়ায় প্রবীর শ্রুতিমুক্তির স্বস্তি পায়। কিন্তু ভাবতে থাকে সে ওদের বচসা সম্বন্ধেই। সুরেশ কি করে এতে একটা সংশ্লিষ্ট পক্ষ সে বুঝতে পারে না।

সুরেশও একজন বিপ্লবপন্থী রাজনৈতিক কর্মী। সুবিদিত। মতবাদ এবং দল-সূত্রে সে আর আমোদ-পাগলারা এক। প্রভার রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্তে তারও আপত্তি-উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বচসায় যে তীব্রতা এখন জন্মে গেছে তাতে ব্যাপারটা ব্যক্তিগত মনে হতে থাকে। প্রবীরের কাছে। আসল কথা সে ওতে ঝাঁঝালো প্রেমের গন্ধ পাচ্ছিল। সেটা সম্ভব কি করে? প্রেমিক-প্রেমিকার ভূমিকায় সুরেশের পাশে প্রভা কল্পনাগ্রাহ্য মনে হয় না। একটুও না। প্রভার মেসো যত বড়লোকই হোন না কেন। সুরেশও খুব সমৃদ্ধ। সমৃদ্ধি-সচেতনও। প্রবীর বহু বিপ্লবীর সংস্পর্শে এসেছে। সংবাদিকতার দৌলতেও, এমনিতেও। নেতা কর্মী এবং অনুচর পর্যায়ে। অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সে সব্বাইকে আত্ম-সচেতন দেখতে পেয়েছে। অবচেতন মনে তো বটেই, সচেতন মনেও। সুরেশের মধ্যেও সেটা সে লক্ষ্য করেছিল। সেদিক থেকে ওর আর প্রভার মধ্যে প্রেম হতে পারাটা তার কাছে কল্পনাতীত নয়।

কিন্তু সুরেশ বিলেত ফেরত। ব্যারিস্টার। ওখানে সে বহুকাল থেকে এসেছে। তার পাঠ্যজীবনের বেশীর ভাগই ওখানে কেটেছে। বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রভাবে গড়ে উঠেছে ওর রুচি, মূল্যবোধ, আচার-ব্যবহার, মতিগতি। ওর

পুরদোস্তুর ভারতীয় পোষাকে সেটা চাপা পড়েনি। সংস্কৃতিসুষম হয়েছে। আর প্রভা? ওর যৌবনশ্রী গ্রামীনতা স্নিগ্ধ, কিন্তু ওর সাংস্কৃতিক-সত্তা গ্রামীনতা রুক্ষ! অবশ্য বৈপরিত্যজাত আকর্ষণ বলে একটা জিনিস আছে। এদের প্রণয়-সুবাসিত বন্ধুত্ব কি তারই একটা চমক জাগানো উদাহরণ? না এতে রয়েছে রাজনীতি-জাত আবেগ ঐক্য?

প্রবীর ভাবতে থাকে সুরেশের কথা। তারা দুজনের মধ্যে এটাই প্রথম সাক্ষাৎ। কিন্তু সুরেশের একটা জীবন খণ্ড রাজনীতি ঘেঁষা শিক্ষিত সমাজের অনেকের কাছেই সুবিদিত। বোম্বে অঞ্চলে তাকে কখনো না দেখতে পেয়েও তার চেহারা চিনতো অনেকেই। সংবাদপত্রে ছাপানো ছবি থেকে।

সুরেশের এই সাংবাদিক প্রসিদ্ধির উপলক্ষ ছিল স্পেনের গৃহযুদ্ধ। বিশ্বের যে কোন অংশের মুক্তি সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী ভারত সক্রিয় সমর্থক। এই সমর্থন উদাহরণ উজ্জ্বল হয়েছে বহু উপলক্ষে। কিন্তু তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েট ইউনিয়নের আত্মরক্ষা সংগ্রাম, জাপানের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিরোধ-অভিযান, আর স্পেনের যুগান্তকারী গৃহ-যুদ্ধ। জাতীয়তাবাদী ভারতের বিশ্ব-ভূমিকা এই তিনটি উপলক্ষের একটাতেও স্রেফ শুভেচ্ছায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। সংগ্রাম সম্পৃক্ত হয়েছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ উপলক্ষে এই সংগ্রাম-সম্পৃক্তি ছিল বিলাতকেন্দ্রিক। আর যাদের ভূমিকা এতে প্রাধান্য লাভ করেছিল তাদের অধিকাংশই ছিল ছাত্রছাত্রী। সুরেশ তাদেরই একজন।

কিন্তু তার ভূমিকা একটা বিজ্ঞপ্তি উজ্জ্বল ব্যক্তিগত উদাহরণ হয়ে ওঠে অন্য কারণে। ঐ ঐতিহাসিক ঘটনা উপলক্ষে একটা আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। তাতে সে সম্মুখ যোদ্ধার ভূমিকায় নেমে আহত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক মুক্তিবাহিনীর সংগ্রাম আহত সৈনিকদের একজন হয়ে তাকে অনেক দেশ ঘুরতে হয়েছিল। নিমন্ত্রিত হয়ে। তার দেশে ফিরে আসাটাও একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ছিল। কারণ সমুদ্র পথেই তাকে কয়েদ করা হয়। রাজবন্দী হিসেবে।

॥ ছয় ॥

স্মৃতি-নিকেতনের অধিবাসী দুজন প্রভাতী চা-টা একত্রে খেতো। পত্রিকা দেখা এবং পাঁচমিশেলি আলাপ-সালাপের সঙ্গে মেশানো এই চা-পর্বটা হতো খুব উপভোগ্য। রোববার-টোববারে চলত অনেকক্ষণ। সে রোববারে এই বৈঠকটা আরো ভাল জমার কথা ছিল। বাড়িতে সাহচর্য-যোগ্য তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি হেতু। কিন্তু প্রবীর ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে বসার ঘরে যেয়ে দেখে সেখানে কানু একা, তার সামনে সাজিয়ে রাখা চা'র সরঞ্জাম দুজনের জন্যে। কি রে, চা'র কাপ দুটো যে ? সুরেশ ওঠেনি এখনো ? প্রবীর বসে যেয়ে জিগ্যেস করে।

ও বেরিয়ে গেছে। কোথায় জানি একটা মিটিং আছে। দুপুরের খাওয়াটা এখানে খেতে বলে দিয়েছি। সময় হলে আসবে।

না এলে বড় আপশোষ হবে। ওর সঙ্গে একটু আলাপ-টালাপ করার সুযোগই পেলাম না। আচ্ছা, কাল রাতে তোরা তিনজন কি নিয়ে এতো বকাবকি করছিলি ?

সেটা তুই জানিস না ?

প্রভা রাজনীতি ছেড়ে দিচ্ছে বলে ?

হ্যাঁ।

কিন্তু ওর আর সুরেশের মধ্যে এতো ঠোকাঠুকি হলো কেন ? তুই তো স্রেফ মধ্যস্থতা করছিলি মনে হচ্ছিল ?

সে অনেক কথা। ওরা দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা। লুকোচুরি করে নয়, প্রকাশ্যে। সেজন্যেই ওরা এখন বোম্বেতে আত্মনির্বাসিত।

আত্মনির্বাসিত ! কেন ?

সেটা বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে মুশকিল। অন্যের ঘরোয়া ব্যাপার জড়ানো আছে। বলতে বাধে। সব কথা জানতে যাইওনি কখনো।

মোটামুটি পরিস্থিতিটা ? না তাও অবক্তব্য ?

না, সেটা বলতে পারি।

সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কারণে ওদের বিয়ে হওয়া খুব সহজ নয়। আমেদাবাদে জনমত রক্ষণশীলতা-তপ্ত। যাদের মধ্যে বিয়ে হওয়া সম্ভব না

তাদের মধ্যে প্রেম দুর্নামপ্রসূ। শহর জীবনের এটা নতুন কিছু নয়। আমেদাবাদেও আরো মানুষ আছে যাদের নামে এ ধরণের দুর্নাম শোনা যায়। কিন্তু এরা দুজন রাজনৈতিক কর্মী, একটা বিপ্লবী দলের সদস্য। কর্মীদের সুনাম দুর্নাম দলের পক্ষে উপেক্ষণীয় নয়। ওদের ব্যাপারটা এমন যে দলের তরফ থেকে আপত্তি ওঠানোর ফুরসৎ নাই। তাই দলের অনুমতি নিয়ে ওরা বোম্বেতে চলে এসেছে।

কিন্তু শোন,—বিবৃতি শেষ করে কানু বলে,—কথাটা যখন উঠেছে তখন তোর একটা মত নিয়ে নিই। সুরেশকে আমি এখানে থাকতে বলতে চাই। ও আমার বাল্যবন্ধু। তোর কি মত?

সে তো খুব ভাল হবে। থাকারও কোন অসুবিধে হবে না। ফ্ল্যাটে পাঁচ-পাঁচটা ঘর।

সব কথা ভাল করে ভেবে ছ্যাখ্।

কিছু ভাববার নেই এতে।

তাহলে সুরেশকে এখানেই থাকতে বলব?

নিশ্চয়।

সাত

ইতিমধ্যে শিপ্রা সাতুস্করের সঙ্গে প্রবীরের বন্ধুত্ব খুব ঘনিয়ে উঠছিল। তারা এখন একত্রে সিনেমা-টিনেমা দেখে, সুযোগে-সুযোগে একটু-আধটু হাত ধরাধরি-গা-ছোঁয়াছুঁয়ি করে। কিন্তু প্রবীরের সাফল্য উৎসাহ অনাবিল থাকে না। যা তার কাম্য ঠিক তা-ই সে পেতে যাচ্ছে মনে হয় না। মন সন্দেহ-ক্ষুব্ধ হয়। মাঝে মাঝেই।

নানা কারণে পরিস্থিতি আবছাও থাকে। শিপ্রা যে সমাজচক্রের মেয়ে তাতে ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে হাত-ধরাধরি-গা-ছোঁয়াছুঁয়ি ইত্যাদি সাহচর্য সুখের বৈধ উপচার। অন্যদিকে আছে ওর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। ওর বদনাম যাই থাক, মূলতঃ ও জীবনযোদ্ধা, উপার্জন-নির্ভর উন্নতির জন্যে ও ছেলেদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রয়াসী। ও যে চালু মেয়ে, সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। যার

সঙ্গেই ওর হাসিল করার মতো কাজ থাকে কিম্বা থাকা সম্ভব মনে হয়, তার সঙ্গেই ওর অবাধ মেলামেশা। কিন্তু সামনে একটা চাতুর্য-বোনা রক্ষাপর্দা ঝোলানো রেখে। প্রবীর নিজেও ওটার উপস্থিতি অনুভব করে, কয়েকবার অনুভব করেছে। অন্ধকারে নিরালায় বসে আলাপ-সালাপ করতে করতে তারা হাত ধরাধরি কিম্বা গা-ছোঁয়াছুঁয়ি পর্যায়ে পৌঁছে গেল। কিন্তু শিপ্রা হয়তো হঠাৎ বলতে আরম্ভ করবে মেয়েদের পক্ষে আত্মনির্ভরশীল জীবন অভিযানে নামার কতো বিপদ। সদৃষ্টান্ত। এরকম পরিস্থিতিতে প্রবীর শত চেষ্টাতেও নিজের ব্যবহারে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে না। তার যে হাতে শিপ্রার হাত মুঠো-বন্দি সে হাতের উষ্ণতা ধাঁ করে নেমে যায় কয়েক ডিগ্রী নীচে। শিপ্রা সেটা লক্ষ্য করে কিনা বোঝা যায় না। কিন্তু প্রবীরের মুঠো শিথিল হয়ে যায়, গা'র আড়মোড় ভাঙ্গা কিম্বা সে ধরণের স্বাভাবিকতা-আশ্রিত অন্য কোন ছুতোয় সে শিপ্রার হাত ছেড়ে দেয়। একটু সরেও বসে।

শিপ্রার এই আত্মরক্ষা-প্রয়াস ব্যতিক্রমবিহীন নয়। প্রবীরের মনে হয় তার ক্ষেত্রে ওর প্রতিরোধ-প্রয়াস মেয়েলী বাহানাবাজী, বন্ধুত্ব কোমল প্রত্যাখ্যান সঙ্কেত নয়। কিন্তু ?—যাক, দেখা যাক কি হয়। সে ধৈর্য ধরে।

কিন্তু সময় যতই বয়ে যেতে থাকে ততই সে সন্দেহ নিপীড়িত হতে থাকে। সবুরের ফল মিঠে হতে পারে, কিন্তু সবুর করতে থাকলে মেওয়া যে ফলবেই তার কি নিশ্চয়তা আছে ?

শিপ্রা প্রায়ই স্মৃতি-নিকেতনের ফ্ল্যাটটা দেখতে চায়। একে ওটা এক ক্রোড়পতির একমাত্র মেয়েকে দেওয়া যৌতুকাংশ। দ্বিতীয়তঃ, প্রবীর ওটার আসবাবপত্র এবং নির্মাণ-শৈলীর আধুনিকতা ব্যাখ্যায় অনেক কিছু বলেছে। কিন্তু শিপ্রাকে প্রবীর ওখানে যেতে ডাকে না। বলে, তাকে অপরের ফ্ল্যাট দেখাতে তার বাধে। নিজের ফ্ল্যাট হোক আগে। স্মৃতি নিকেতনে অন্যান্য লোক থাকার কথাটাও উল্লেখ করা হয়।

আসল কথা ছিল শিপ্রা সম্পর্কে প্রবীরের মত-অস্থৈর্য। যা সে চায় সেটা তার কাছে স্পষ্ট। কিন্তু শিপ্রা ? ওর কাছে যা পাওয়া সম্ভব তার চেয়ে বেশী চাইতে গেলে দাবীর ভারে যদি আশা-সৌধটার ভিতটুকুই ধসে পড়ে ? তার চেয়ে যা পাওয়া সম্ভব তাতে সন্তুষ্ট হওয়াই কি ভাল নয় ? বাস্তববাদের দিক থেকে ?

স্মৃতি-নিকেতনে সকাল দশটা-সাড়ে-দশটা থেকে বিকেলে আটটা-সাড়ে-আটটা পর্যন্ত ফ্ল্যাটের অধিবাসিরা সবাই বাইরে থাকে। কাজের দিনে। আর কাজের

দিনগুলোই এক অপরাহ্নে ওখানে আসবার জন্যে শিপ্রাকে প্রবীর নিমন্ত্রণ করে। ঐ সময় বাড়িতে অধিবাসিদের আর কেউ যে থাকবে না, সেটা উল্লেখ করে। বিশেষভাবে। নির্দ্বিধায় নয়। আনঙ্গিক ঝোঁকে।

শিপ্রা নিমন্ত্রণ করার ধরণটা যে লক্ষ্য করেছে, সেটা বোঝা যায়। কিন্তু সে ওটা সরাসরি নাকচ করে দেয় না। অজুহাত দেখায়। আফিসের সময়। দূরও অনেক। পুরো একটা দিন কাজের ক্ষতি হবে। তার মতো একজন নবীসের পক্ষে সেটা ভাল হবে না। ইত্যাদি।

প্রবীর জেদাজেদি করে না। শুধু বলে, তুমিই ওখানে আসতে চেয়েছিলে। আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করলাম। এখন তোমার যা ইচ্ছে করো। আমি কাল সারা দুপুর বাড়িতে অপেক্ষা করব। এ সম্পর্কে আর কিছু বলা-কওয়া হতে দিতে সে যে প্রস্তুত নয়, সেটা দেখায় সে হন হন করে চলে গিয়ে। পেছন থেকে শিপ্রার "এই শোন" আহ্বান উপেক্ষা করে।

কিন্তু পরদিন অসুস্থ হবার অজুহাতে বাড়িতে থেকে গিয়ে প্রবীর নতুন করে দ্বিধা-উৎপীড়িত হতে থাকে। যা করা হয়েছে সেটার ঔচিত্য নিয়ে। এমন সময় সেখানে আসে অম্বা।

স্মৃতি-নিকেতনে ঘরোয়া কাজগুলো করার জন্যে দুজন পরিচারিকা ছিল। একটি ঠিকে। যে মাজা-ঘসা ধোয়া-মোছা ইত্যাদি করতো। রান্নাবান্না এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলোর জন্যে ছিল স্থায়ী পরিচারিকা, অম্বা।

এই কাহিনী-কাঠামোতে অম্বার ঠাইটা যখন নজরে আসে তখন সে ত্রিশ-পূর্ব বয়সের বিধবা। কিন্তু বৈধব্য একটা দুর্ভাগ্য, ব্যক্তি-সত্বার অভিব্যক্তি নয়। ও ছিল যেমন চতুরা কর্মঠা বাক-নিপুণা শ্রম-আমোদী এবং হাস্যরসিকা, তেমনি জীবন-পিপাসু। ছিল সে আবার ত্রিভাষী। জন্মসূত্রে সে গুজরাটি। কিন্তু মারাঠী এবং বোম্বে হিন্দিতেও তার অধিকার সমান। কারণ সে বস্তি-কন্যা, তার মা-বাবা দুজনেই মিল-মজদুর। এই নারীকুল বিস্ময়টিকে স্মৃতি-নিকেতনের ফ্ল্যাটে অধিষ্ঠিতা করেন নিরুর মা-বাবা। মালাবার হিলে তাঁদের প্রাসাদসম বাড়িতে দু-তিনজন মালী কাজ করতো। ও ছিল ওদের একজনের বিধবা স্ত্রী।

অম্বা এসেই জিগ্যেস করে, কেমন আছ প্রবীরভাই?

তেমন ভাল লাগছে না।

তাহলে নাস্তা করবে না?

নাস্তা? আচ্ছা দে, খেয়েই নিই কিছু।

অম্বা খিল খিল করে হাসে। তোমার কি অসুখ জান? সোহাগ-তৃষ্ণা।

প্রবীর তেড়ে ওঠে। যা যা, বেশী ফাজলামী করবিনে কিন্তু, বলে দিচ্ছি। নাস্তা নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি। আমার খিদে পেয়ে গেছে।

স্মৃতি-নিকেতনে খাদ্য-রীতি ছিল স্বদেশী-বিদেশী। অম্বা গ্লাসে করে কিছু গ্রেপ-ফ্রুট অর্থাৎ বাতাবী লেবুর রস এনে প্রবীরের সামনে রাখতে রাখতে বলে, প্রবীরভাই, তোমার কোন মেয়ে-বন্ধু নাই?

প্রবীর ক্ষুধায় ছটফট করছিল। অসুখের অছিলায় কাজ কামাই করায় সে এতক্ষণ খায়নি। অন্যান্যদের বেরিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। বাতাবী লেবুর রসটুকু এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে সে বলে, তোর ফাজলামো কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে অম্বা। যা খাবার নিয়ে আয়। আর শোন, অসুস্থ আছি বলে ডিম বাদ দিবিনে। দুটোই নিয়ে আয়। পরিজও একটু বেশী করে আনবি। যদি বেশী না বেঁচে গিয়ে থাকে তবে কিছু কর্ণ-ফ্লেক নিয়ে আসবি। টোষ্ট চাই তিনটে। আর হ্যাঁ, আমার সঙ্গে ফাজলামোটা একটু কম করবি কিন্তু, আমি সতর্ক করে দিচ্ছি।

অম্বা ভড়কে যায় না। খালি গ্লাসটা তুলে নিতে নিতে বলে, অসুখ হয়ে কাউকে এমন ঘোড়ার মতো খেতে দেখিনি। তরকারীতে দেবার জন্য কিছু ছোলা ভিজিয়ে রেখেছি। গোটা। ওগুলোও নিয়ে আসব?

আবার? প্রবীর শাসায়।

খাদ্য-তালিকার প্রথম প্রস্তুটা সাবাড় করে ক্ষুধার জ্বালাটা একটু কমিয়ে প্রবীর ভাবতে থাকে তার প্রণয় সমস্যার কথা। সেই সঙ্গে জাগে আরো একটা প্রশ্ন। অম্বাকে বাড়িতে থাকতে দেওয়া উচিত কি না? এই অপরাহ্ণ-মিলন হবে কি হবে না অনুমান অতীত। কিন্তু হোক আর না হোক, বাড়িতে তখন একজন সাক্ষী মজুদ রাখাটা কি নির্বুদ্ধিতা হবে না? শিপ্রাই বা সেটা কি ভাবে দেখবে?

প্রবীরের নাস্তা খাওয়া হয়ে যায়। অম্বা আসে এঁটো বাসনগুলো সরিয়ে নিতে। ওকে প্রবীর বলে। তোকে আজ ম্যাটিনী শোতে সিনেমা দেখতে পাঠাব ভাবছি।

কেন? পাস আছে নাকি?

না, পাস-টাস নেই, টিকিট কিনে যেতে হবে। ভয় নেই। দুটো টিকিটেরই পয়সা দেব। এখন যা, আমার জন্যে যা হয় একটা কিছু রান্না করে নে। বেশী

কিছু করতে যাবি নে। নাস্তা যা হয়েছে না, দুপুরে হয়তো কিছু খেতেই পারব না। খিঁচুড়ী-ফিঁচুড়ী যা হয় একটা করলেই চলবে।

অম্বা প্রবীরের দিকে তাৎপর্যময় দৃষ্টির এক ঝাপটা ছড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এঁটো বাসনগুলো নিয়ে। লাইটারে সিগারেট ধরানোর ছলে প্রবীর অম্বার দৃষ্টিবান উপেক্ষা করে। কিন্তু তার কফি খাওয়া তখনো বাকি ছিল। সেটা পরিবেশন ক'রতে এসে অম্বা বলে, আমাকে তুমি দুটো টিকিটের দাম দিতে যাচ্ছ কেন?

কেন আবার কি? তোকে একা সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছি কখনো?

আর আর দিন পাস থাকে।

নগদ পয়সা দিতে হচ্ছে বলে তোকে একটা টিকিটের পয়সা দিলে তুই আমাকে কিপটে ভাববিনে?

অম্বা আর কিছু না বলে প্রহেলিকা-ঘন হাসিতে মুখ ভাসিযে তার কাজে চলে যায়। প্রবীর মুখ ফিরিয়ে থাকে। নিজের হাসি লুকোতে।

স্মৃতি-নিকেতনে অম্বার উপস্থিতি ছিল এক বৈচিত্র্য-বহুল এবং সদা বিদ্যমান খুশী-তরঙ্গ। প্রবীরের কাছেই নয়, অন্যান্যদের কাছেও। বাক-চাতুর্য এবং হাস্য-প্রিয়তার মতো ওর চেহারাও তার কারণ ছিল। কল্পনার তুলিতে নীল পেড়ে সাদা শাড়ি পরা একটা চামচিকে আঁকলে যে ছবিটি ফুটবে, সেটাই হবে অম্বার প্রতিকৃতি। হুবহু। ও ছিল যেমন মিশমিশে কালো, তেমনি খর্বকায়া। চলতোও তিরতির করে। সন্ধ্যায় মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায় চামচিকেদের মতো। ওর হাসি-মুখের উপমা নাই। কারণ চামচিকে তো কখনো হাসে না। তবে চামচিকেকে হাসতে দেখা কল্পনা করতে পারলে, সেটাই হবে অম্বার হাসিমুখের ছবি। ও হাসলেই ওর ঠোঁটের কোণ দুটো সরে চলে যেতো প্রায় ওর কর্ণমূল পর্যন্ত। আর সঙ্গে সঙ্গে যে দুপাটি দাঁত দেখা যেতো তা ছিল যেমন মিহি তেমনি ঠাসা এবং চিকচিকে সাদা। কিন্তু পান-দোক্তার কল্যাণে কালিমা-চিহ্নিত। যথেষ্ট। ওকে হাসতে দেখে হাসি পেতো না মানুষ বিরল ছিল।

প্রবীর ভেবেছিল অম্বা-সমস্যাটা মিটে গেছে। কিন্তু কফির সরঞ্জামগুলো সরিয়ে নিতে এসে ও বলে, জান প্রবীর ভাই, প্রথম প্রথম আমি ভাবতাম, কানু-ভাইর এতো এতো বন্ধু। স্বজাতির মধ্যেও। তবে সে বেছে বেছে তোমাকেই এখানে থাকবার জন্য ডেকে নিয়ে এল কেন? এখন আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি, কেন।

কেন ?

তুমি মানুষটা একটু অন্য ধরণের।

প্রবীর পত্রিকা পড়ছিল। সেটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে বলে, কি রকম ? আমার মাথায় শিং-টিং আছে না-কি ? বলতে বলতে সে তার কপালে হাত বুলয়।

তার নমুনা দেখে অম্বা হেসে বাঁচে না। কিন্তু হাসি থামলে সে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, আমি হাসি-তামাসার কথা বলছি না। তোমার মনটা কোমল। তোমার মধ্যে সাচ্চাইপনা আছে, ইনসানিয়ৎ আছে। পারলে তুমি মানুষের ভাল করবে, অনিষ্ট ককৃখনো না।

প্রবীর একটু বিব্রত বোধ করে। অম্বাকে কখনো কখনো রাগ করতে কিম্বা চুপ হয়ে থাকতে দেখা যায়, গম্ভীর ককৃখনো না। আসল কথা, ওর একজন কৃপাভাজন ছিল। লোকটা বেকার। কয়েক বছর ধরে। তার আগে ও-লোকটাও একটা কাপড়ের মিলে মজদুরী করতো। একটা ষ্ট্রাইক উপলক্ষে নেতাগিরি ফলাতে যেয়ে কাজ হারায়। লোকটা অকর্মণ্য নয়। বুদ্ধিসুদ্ধিও আছে। কিন্তু তবু আর কাজ পায়নি। এটা সেটা করে পেট চালায়। লোক ওকে শ্রম-কাতর ভাবে। সিনেমায় ওকে সাথে নিয়ে যাবার জন্যেই অম্বাকে প্রবীর দুটো টিকিটের পয়সা দিতে যাচ্ছিল। তাই বলে এই ব্যাপারে ওর স্বীকৃতি-বন্দি দরদী হবার ইচ্ছে ছিল না প্রবীরের। প্রবৃত্তিও না। সে আবার পত্রিকাটা তুলে নিয়ে বলে, পাসের বদলে পয়সা দিয়ে সিনেমা দেখতে পাঠাচ্ছি বলে আমাকে তোষামোদ করতে হবে না। নিজের কাজে যা।

না না, প্রবীরভাই, আমি তোমাকে তোষামোদ করছি না। তুমি আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের মতো নও, একটুও না। ওদের সঙ্গে তুমি মেলামেশা কর, কিন্তু ওদের মধ্যে মিশ খাও না। আমার চোখে কিছুই বাদ যায় না। আমি সব দেখি।

অম্বা চলে যায়। আর প্রবীর কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে থাকে। হাত থেকে একটা পত্রিকা নামিয়ে রেখে আর একটা পত্রিকা তুলে নেয়। কিন্তু পড়তে পারে না। আস্তে আস্তে সে চিন্তা-উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে। বসে থাকতে পারে না। ওঠে পায়চারি করতে আরম্ভ করে। ঘরেই। মাথা নুইয়ে, খেই হারা হয়ে ওঠা দৃষ্টি মেঝের দিকে নিবদ্ধ রেখে। একটানা নয়, হঠাৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেয়ে। মাঠমুখো জানালা দুটোর একটা না একটার পাশে। কখনো কখনো চৌকাঠে ভর দিয়ে নীচের দিকে চোখ রেখে। কতক্ষণ ধরে, সে খেয়াল তার

থাকে না।

রান্নাবান্না সেরে অম্বা এসে বলে, চান করতে যাও প্রবীরভাই, খাবার তৈরী।

প্রবীর চমকে ওঠে। অম্বা অবাক। হেসে বলে, কি হলো? চমকে উঠলে যে।

কিছু না, তুই চলে যা। আমার খেতে-টেতে দেরী হবে।

অম্বার অবাক হওয়ার ভাবটা তখনো কাটে না, বাড়ে। প্রবীরের ভাবসাব তার কাছে অদ্ভুদ ঠেকে। কিন্তু তার সিনেমা দেখার সময় হয়ে গিয়েছিল। সে চলে যায়। আর একটুক্ষণ বাদে প্রবীরও যা করে বসে তা সত্যিই অদ্ভুত হয়। অত্যন্ত। দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিয়ে সে-ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ক্ষিপ্র পদে, উচ্চকিত হয়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রবীরের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব-কাঠামো এবং জীবন-নকশা গড়ে উঠেছিল স্বাতন্ত্র্য-বন্দি পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতে। প্রাক-যৌবনে পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে, পরবর্তী-কালে শহরে পরিবেষ্টনে। মুখ্যতঃ বোম্বেতে। কিন্তু সর্বত্র এবং সর্বদা তার মনকে জিজ্ঞাসা-শাণিত করে করে।

যে গ্রামে তার প্রাক-যৌবনকালীন আত্ম-সংগঠন হয় সেটা ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমায়। নাম কদমতলা। ওখানকার পুরকায়স্থরা ছিল ডাক-সাইটে গোষ্ঠী। অনেককাল থেকেই। বস্তুতঃ তাদের সমৃদ্ধি, প্রতিপত্তি এবং আভিজাত্য ও অঞ্চলে একটা কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছিল। কয়েক পুরুষে অবশ্য এক ঘর ভেঙ্গে ভেঙ্গে অনেক ঘর হয়ে যায়। তখন কারো কারো অবস্থা দারিদ্র্য সীমায় নেমে আসে। কিন্তু কারো কারো অবস্থা আদি ঘরের খ্যাতিকেও ম্লান করে দেয়। বহুলাংশের অবস্থা থেকে যায় মোটামুটি

সচ্ছল। প্রবীরের অভিভাবকেরা ছিলেন গ্রামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য এবং সংস্কৃতি-উজ্জ্বল।

এ ধরণের ভারতীয় পরিবারে অনুজদের প্রথম সন্তানরা অত্যন্ত আদরণীয় হয়। সে সন্তান পুত্র হলে সে হয় জীবন-জ্যোতি। সারা পরিবারের। প্রবীর ছিল শুধু প্রথম-বংশধরই নয়, তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান। কিন্তু তার ভাগ্যে জোটে অনাদর, অবহেলা, আত্ম-অবমাননা। জন্মবৈচিত্র্যহেতু। কারণ সে ছিল ক্ষেত্রজ্ঞ।

কদমতলার শশাঙ্ক পুরকায়স্থ সন্ত্রাসবাদী মুক্তি-সংগ্রামী ছিল। মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষালাভ হয় তার মানিকতলা বোম্ব কেসের আমলে। কলকাতায় কলেজে পড়তে যেয়ে।

কিন্তু আন্দোলনে হাতে-খড়ি হতে না হতেই যায় সে ধরা পড়ে। জেল এবং অন্তরীণে দু-তিন বছর কাটিয়ে যখন সে ছাড়া পায় তখন সন্ত্রাসবাদী দলগুলো ছত্রভঙ্গ, সার্বিক আন্দোলন হৃত-অস্তিত্ব। শশাঙ্ক দমে যায় না। নিজের দলের কে কোথায় আছে খোঁজে খোঁজে বার করে। দলে সাড়া জাগে। প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী দলগুলোতেও উদ্যোগ-চাঞ্চল্য দেখা দেয়। পুরো আন্দোলনে পুনরুজ্জীবন-তাড়না জন্মায়।

পৃথিবীর সর্বত্রই মুক্তি আন্দোলনের বাঁকে বাঁকে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বঙ্গীয় সন্ত্রাসবাদীদের পুনরুজ্জীবিত আন্দোলন-উদ্যমও এই অভিশাপের কবলে পড়ে। নানা ধরণের ভিন্নাভিন্নতা বোধ সব দলেই ফাটল ধরায়। সার্বিক আন্দোলন হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব-ব্যাহত।

কিন্তু ভারতে সন্ত্রাসবাদ এক বৃহত্তর আন্দোলনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। জাতীয়তাবোধ ছিল যার প্রাণস্পন্দন। তাতে জন্মে গিয়েছিল স্বতস্ফূর্ত ঐতিহ্য-উন্মাদনা। এক দিকে সিভিল-সার্ভিস, স্বদেশী, বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ, প্যারিসে মাদাম কামা কর্তৃক ভারতীয় জাতীয় পতাকার নকশা উদ্ভাবন ইত্যাদির আবেগ তরঙ্গ সারা ভারতে জাগিয়েছিল মুক্তিকামী একাত্মবোধ। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে যশবন্ত বলবন্ত ফাড়কের কৃষক-কীর্তি, বাংলায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি, অরবিন্দের আত্মনির্বাসন, বিলেতে মদনলাল ধিংড়ার বীরত্ব-বিস্ফোরণ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তিলকের নির্বাসন-আজ্ঞার প্রতিবাদে বোম্বেতে ঘটা সাত-দিনব্যাপী শ্রমিক বিদ্রোহ হয় ভ্রূণাবস্থা প্রাপ্ত বিপ্লব কল্পনার আসন্ন জন্ম-লক্ষণ। মুক্তিকামী জাতীয়তাবাদের এই দ্বিমুখীন আবেগ-স্রোতের মোহনা হয় যুব-মন। আর এই সঙ্গম-শক্তির এক প্রতিভাধর শিক্ষিতাংশ সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায়

নতুন শোণিত-স্রোতের উৎস। অন্তর্কলহ-দুর্বল আন্দোলন আবার হতে থাকে যৌবনপুষ্ট।

বাইশ-তেইশ বছর বয়স্ক শশাঙ্কর মুখ্য ভূমিকা-মঞ্চ হয় পূর্ববঙ্গের ঢাকা ময়মনসিংহ এবং কুমিল্লা জেলাগুলো। মহকুমা-শহর নেত্রকোনায় তখন তার বড় ভাইদের একজন উকিল, অন্যজন ডাক্তার। সেখানেই তাঁরা থাকেন। নিজের বাসায়, সপরিবারে। শশাঙ্কও তার সদর কেন্দ্র করে সেখানেই।

কিন্তু নেত্রকোনা থেকে কদমতলা মাত্র মাইল দু-আড়াই দূর। পুরকায়স্থ ভ্রাতৃত্রয়ের পিতা থাকতেন সেখানেই। সম্পত্তির তদারকার্থে। ফলে শশাঙ্ক গ্রামের বাড়িতে থাকতে যেতো অহরহ। পিতার প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করতে নয়, পিতৃসেবার অজুহাতে গোপনীয় রাজনৈতিক কাজকর্ম সারতে। পুলিশের চক্ষু এড়িয়ে। সেখানে তার আওতায় এসে যায় তার এক জ্ঞাতি-খুড়ি। উদ্ভিন্ন-যৌবনা সাবিত্রী পুরকায়স্থ।

শশাঙ্কর আওতায় আসার আগেও সাবিত্রীর জীবন পারম্পারিকতা ধূসর ছিল না। তার পিতা দেবপ্রসাদ দত্ত-মজুমদারের এগারোটি সন্তানের সব কয়টিই ছিল মেয়ে। অন্যান্য যে কোন ভারতীয়ের মতো তাঁরও পুত্রবাসনা ছিল সর্বাতিসর্ব। এতো কয়টি সন্তানের একটিও পুত্র না হওয়ায় তিনি হতাশা-বিদলিত না হয়ে কনিষ্ঠা কন্যা সাবিত্রীকেই ছেলের মতো লালন-পালন করতে আরম্ভ করেন। বেশভূষায় কেশ-বিন্যাসে শিক্ষা-দীক্ষায়।

অবশ্য তাঁর এই খেয়াল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সাবিত্রীর বয়েস সাত-আট হতেই তার পোষাকী ছেলে-পরিচয়ের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সর্বতোভাবে নয়। দেবপ্রসাদের ইচ্ছায় অল্প বয়সেই সাবিত্রীর বিয়ে হয়ে যায় না। তার পড়াশোনাও চলতে থাকে। সে ছেলে হলে যেমন ভাবে চলতে থাকতো। তবে বাড়িতে। হয়তো নেত্রকোনায় তখন পর্যন্ত কোন মেয়ে স্কুল না থাকায়।

ক্ষুদে-শহর নেত্রকোনায় গুজব-আমেচীদের আলোচনা উপচারের একটা অফুরন্ত উৎস ছিলেন এই দেবপ্রসাদ। তিনি ছিলেন এক প্রতিশ্রুতি-ব্যর্থ উকিল। ওকালতি পাশ করে পড়াশোনা শেষ না করা পর্যন্ত তাঁর পাঠ্য-জীবন ছিল কৃতিত্ব উজ্জ্বল। কিন্তু আইন ব্যবসায় সম্পূর্ণ অপারগ প্রমাণিত হন। বদমেজাজী হবার ফলে। অন্তত জনমত ছিল তা-ই। তিনি বংশেও ছিলেন কায়স্থদের মধ্যে কুলীন-চূড়ামণি। কিন্তু ভূ-সম্পত্তি-নির্ভর অন্যান্য বহু অভিজাত পরিবারের মতো তাঁরও অপ্রচারিত পিতৃ-ঋণ হয়ে উঠেছিল সর্বগ্রাসী। পিতার মৃত্যুর পর, সর্ব-

জ্যেষ্ঠ হওয়ায় একান্নভুক্ত পরিবারের যেটা ছিল তাঁদের অংশ তারও দায়িত্ব পড়ে তাঁর-ই ওপর। অভাব-উৎপীড়িত হয়ে তিনি পূর্ববঙ্গের একটা কানুনী ইতিহাস লিখে ফেলেন। তাতে তাঁর বেশ নাম হয়, কিন্তু আয়বৃদ্ধি হয় না। অন্ততঃ উল্লেখযোগ্য কিছুই না। এই পরিস্থিতিতে নেত্রকোনার একটা হাইস্কুলে হেড-মাস্টারের পদটা খালি হয়। তিনি দরখাস্ত করেন এবং নিযুক্তও হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই চাকরীটাও তাঁর চলে যায়। পানাসক্ত হবার অপবাদে। অনন্যোপায় হয়ে তিনি ওকালতি করেই কায়ক্লেশে সংসার চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে হঠাৎ হঠাৎ উচ্চমানের কোন সাময়িকীতে ছাপানো তাঁর লেখা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-টবন্ধ সমাজকে জানিয়ে দেয়, দারিদ্র্য এবং দুর্দশা তাঁর যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, তাঁর প্রতিভা হৃতদীপ্তি নয়। তাঁকে গতানুগতিকতা মুক্ত কোন না কোন কিছু করতে দেখা যেতো প্রায়ই। তা নিয়ে শহরে হাসাহাসি হতো, কিন্তু টিটকারী-বাণের ছুড়াছুড়ি হতো না। সাবিত্রীর লালন-পালন পদ্ধতি নিয়েও হয়নি।

কিন্তু যেদিন শাঁখ সানাই এবং উলুধ্বনি মুখর প্রাঙ্গন থেকে পাল্কী চড়ে দেবপ্রসাদের দশমা কন্যা প্রথমবার শ্বশুর বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়, সেদিন তাঁর মনে হয় তাঁর আত্মিক-সত্তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। বৈষয়িক সত্তা তো চুরমার হয়ে গিয়েছিল কবেই। তবু সাবিত্রীর পড়াশোনা চলতে থাকে। তাকে পড়াতেন দেবপ্রসাদ নিজেই। পারিবারিক দায়িত্ব কিছুটা কমে যাওয়ায় শিক্ষাদানে দেখা দেয় নতুন আগ্রহ। কারণ সাবিত্রীর ধীশক্তির প্রখরতা ইতিমধ্যে অসাধারণ প্রমাণিত হয়েছিল। তাছাড়া সে যেমন প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তেমনি তেজস্বীনি। তার প্রতিভা দেবপ্রসাদের পুত্রহীনতাখেদ অনেকখানি লাঘব করে।

কিন্তু সেটা ছিল আত্ম-প্রতারণা। দেবপ্রসাদের তরফে। সাবিত্রীর বয়েস অচিরেই তাঁকে ধাক্কা দিয়ে মনে করিয়ে দেয়, ও মেয়ে—সুন্দর এবং যৌবন-বহুলা।

সাবিত্রীর বয়েস তাঁকে মনে করিয়ে দেয় একথাও, যে দারিদ্র্যে খেয়াল-বিলাসের ফাঁক নেই। গতানুগতিকতা অনুসারে সাবিত্রীকে বিয়ে দেবার কাজে হাত দিলে ভ্রুতি তাড়নার সৃষ্টি হতো না। এক-দেড় বছর নয় দু-তিন বছর হাতে পাওয়া যেত। দেবপ্রসাদ যখন সাবিত্রীর বিয়ের কথা ভাবতে আরম্ভ করেন তখন সে ক্ষিপ্ত-যৌবনা ষোড়শী! অচিরেই তার বিয়ে দিতে না পারলে জাত যাবে। স্ত্রীর কাছে একথা তাঁকে শুনতে হয় প্রতিদিন।

এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যিনি টাকার জোরে সাবিত্রীকে বিয়ে করতে

সক্ষম হন, তিনি পঞ্চাশোত্তর বয়সের এক স-সন্তান দোজবর। কদমতলার শরৎ পুরকায়স্থ। যিনি জ্ঞাতি সম্পর্কে শশাঙ্কর কাকা ছিলেন।

তেজদীপ্তা ধী-শক্তিবহুলা সাবিত্রী তার বিয়েটাকে ভাগ্যের পরিহাস বলে মেনে নেয় না, নিতে পারে না। এ জন্যে কাকে দোষ দেবে, তাও বুঝে না। পিতা দেবপ্রসাদকে সে মনে প্রাণে ভক্তি করে এবং ভালবাসে, তাঁর প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করে। ভুলেও সে তার দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁকে দায়ী করে না। সে শুধু দুনিয়ার বিরুদ্ধেই একটা অন্ধ আক্রোশে জ্বলে পুড়ে মরতে থাকে, সে আগুনের তাপে পরিবার পরিজনও জ্বলে মরে। বিশেষ করে সমৃদ্ধিপুষ্ট স্বামী শরৎ পুরকায়স্থ। এই টাক-মাথা স্থূলোদর তেলচুকচুকে নাদুসনুদুস মানুষটা জ্বলে মরে অনাদরে নয়, অতি আদরে,—এই বিয়ের ব্যাপারে ভুলটা তাঁর ঠিক কোথায় হয়ে গেছে সেটা বুঝে বুঝে। শরৎ পুরকায়স্থ তাঁর পতিত্বের অধিকার দেখিয়ে সাবিত্রীকে শ্রদ্ধানত করতে চান। কিন্তু পারেন না। সাবিত্রী তো ষোড়শী ভার্যাই নয়। সে প্রতিভাদীপ্তা, তার ব্যক্তিত্ব-প্রভার সামনে তাঁকে কেন, বাড়ীর সব্বাইকে কাঁচুমাচু হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু সেখানেই ব্যাপার থেমে থাকে না। পৃষ্ঠ দংশন নিরবলম্বনের অবলম্বন হয়। সেটার জ্বালা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে ঝগড়া-ঝাঁটিতে। তাতে সাবিত্রী পেরে ওঠে না। তার শিক্ষায় বাধে। সে আত্ম-বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে। আর তার এই মানসিক অবস্থাটা যে বুঝতে পারে সে শশাঙ্ক।

সাবিত্রী এবং শশাঙ্কর মধ্যে বয়সের তফাৎ ছিল সামান্যই। দুজনের সম্বন্ধটা আবার খুড়ী-ভাশুর-পো। অচিরেই দুজনের মধ্যে সম্বন্ধটা ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু স্বাদেশিকতার ভিত্তিতে। একদিন শশাঙ্ক সাবিত্রীকে পড়তে দেয় আনন্দমঠ। বইটা তার পড়াই ছিল। দুজনের মধ্যে আরম্ভ হয় আলোচনা। ওটার তাৎপর্য নিয়ে। সাবিত্রী ওটা পড়েছিল পিতার শিক্ষাধীনে। তাঁর ব্যাখ্যা থেকে সে ওটাকে একটা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-কীর্তি বলে মনে করতো। কিন্তু এখন শশাঙ্ক বলে, না, তা নয়। আনন্দমঠ মুক্তিকামী ভারতের প্রথম রণডঙ্কা। শশাঙ্ক খুব ভাল গান গাইতে পারতো। জেল-অন্তরীণ খেটে আসা স্বদেশী হিসেবে তার অত্যন্ত সমাদর। সর্বত্রই। নিজের গ্রামে তো বটেই। সে তার বাড়ি থেকে হারমোনিয়াম আনিয়ে বন্দেমাতরম গেয়ে শোনায়। বাড়ির সবাই সঙ্গীত তৃপ্ত। শশাঙ্ক ব্যস্ত মানুষ। তার গান শোনার সুযোগ গ্রামের লোকেরা পায় কদাচিৎ। খবর পেয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েরা এসে জমা হয়, তাকে আরো

গাইতে বলে, সে গেয়ে যায়। একটা একটা করে অনেক কয়টা। সবই স্বদেশী গান। গায়ও সে প্রাণ ঢেলে। সঙ্গীত বিভোর শ্রোতারা ভাবে, সে তার স্বাদেশিকতায় মেতে উঠেছে। কিন্তু ব্যাপারটা ছিল অন্য। সাবিত্রীকে সে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিচ্ছিল। তার দীক্ষা-প্রয়াস ব্যর্থ হয় না। সাবিত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সে সেটা আন্দাজ করে ফেলে। সে এক সময় গায়,

ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে···

আর তার দেশপ্রেম সিক্ত আওয়াজে গাওয়া সেই গান শুনে সাবিত্রীর চোখ ছলছল করে ওঠে। সে উঠে যায়, কিন্তু পেছনে রেখে যায় তার আবেগ-সত্ত্বা। শশাঙ্ককে ঘিরে।

সন্ত্রাসবাদীদের স্বাদেশিকতা ছিল আবেগপ্রধান। সেটাই ছিল ঐ আমলের যুগ-বাত্যা। সাবিত্রী তাতে ধরা পড়ে। স্বাদেশিকতার মৌল আবেদনটা যতই তার রক্তে অনুভূত হতে থাকে ততই বেঁচে থাকার একমাত্র সার্থকতা দেখতে পায় সে দেশসেবায়। আর এই আগ্রহাতিশয্যে তাকে করা হয় দীক্ষাপ্রাপ্তা মুক্তিপন্থি। গোপনে, অতিশয় গোপনে।

অতিশয় গোপনেই তাকে লাগানো হতে থাকে কাজে। দলেব অনেক গোপনীয় নথিপত্র এবং বে-আইনী পুঁথি পুস্তক শশাঙ্ককে নিজের জিম্মায় রাখতে হতো। সে এ সমস্ত সাবিত্রীকে রাখতে দেয়। শশাঙ্কর জিম্মায় রাখতে হতো পিস্তল-রিভালবার এবং অন্যান্য নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র। অনেক সময় বোমাও। আস্তে আস্তে এ সমস্ত লুকিয়ে রাখার ভারও দেওয়া হতে থাকে সাবিত্রীকেই। মা-বাবাকে দেখে আসার জন্য সে প্রায়ই নেত্রকোনায় যেতো। স্বামী ধনাঢ্য। তার যাতায়াত হতো পাল্কীতে, পাইক-পেয়াদা সহ। কিন্তু তার পাল্কীতে লুকানো থাকে বে-আইনী দলিলপত্র কিম্বা অস্ত্রশস্ত্র।

কিন্তু বৈপ্লবিক হলেও এই তল্পীবাহীর ভূমিকা সাবিত্রীকে সন্তুষ্ট রাখতে পাবে না। সে চায় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। মুখ্যতর ভূমিকায়।

বিপ্লবী আন্দোলনে মেয়েদের স্থান ছিল তখন খুবই সামান্য। নাই বললেও চল্‌তো। বস্তুতঃ. গৃহ-জীবনের বাইবে কোন স্থানই ছিল না তাদের। বিশেষ কবে সমাজের শীর্ষ পর্যায়ে। সাবিত্রীর বয়েস তখনো বিশের নীচেই। কিন্তু যৌবনুন্মত্ত বিপ্লবমগ্নতায় দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সে একদিন হয় কুলত্যাগিনী। পালিয়ে গিয়ে।

সাবিত্রীর উধাও হয়ে যাবার খবরটা বেরোনো মাত্রই যে গুজবটা কালবৈশাখীর মতো চতুর্দিকে ঝাপটা ছড়ায় তাতে থাকে কলঙ্কের ঘনঘটা। বুড়ো বরের সোহাগে অতৃপ্তা যুবতী বৌ কারো সঙ্গে ভেগে গেছে, এটাই হয় সবার অনুমান। কিন্তু কার সঙ্গে? সন্দেহযোগ্য কোন পুরুষকে নিখোঁজ দেখা যায় না। না কদমতলায়, না নেত্রকোনায়।

সংশ্লিষ্ট পুরুষটি অনুমানের বাইরে থেকে যাওয়ায় সাবিত্রীর ভেগে যাবার সংবাদ-চাঞ্চল্যটা নিস্তেজ হতে হতে শেষ পর্যন্ত একটা নীরস জনশ্রুতিতে মিলিয়ে যায়। তবে শরৎ পুরকায়স্থ মুখ-পোড়া হয়ে কাশীবাসী হন। তাঁর আর সাবিত্রীর আত্মীয় পরিজন হন সমাজ-লাঞ্ছিত। বিশেষ করে দেবপ্রসাদ। তিনি জাতে ঠেলা হয়ে থাকার ভয়ানক পরিণামে ভোগেন।

তিন-চার বছর কেটে যায়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তখনো হৃত-অস্তিত্ব নয়। দিল্লীতে গজারূঢ় লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপরে ইতিমধ্যে বোমা আক্রমণ হয়ে গিয়েছিল। তবু সন্ত্রাসবাদীদের একটা সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি বলে কেউ তখনো আবার ভাবতে পারছিল না। উদ্দাম নিষ্পেষণবাদের চাপে তারাও মাথা ভাসাতে পারছিল না তখন পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতে একদিন আচমকা সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ শাসকবর্গকে আক্রমণপ্রয়াসী হয়ে উঠতে দেখে বাংলা, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের কয়েকটা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিস্ময় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিস্ফোরণ-তীব্র হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় প্রতিপক্ষ স্বল্প সংখ্যক ভারতীয় যুবক, তাদের হাতে পিস্তল, গায়ে আটপৌরে পোষাক, কিন্তু চোখে বাত্যার দুর্জয়তা। যুবশক্তি সেদিন পরাভূত হয়। কিন্তু তাদের সবাই ঐ খণ্ডযুদ্ধগুলোর প্রত্যেকটাতে যে সাহস, বিক্রম এবং সামরিক প্রতিভা দেখায় তাতে সারা ভারত গর্বস্তব্ধ, সরকারপক্ষ সন্ত্রস্ত এবং বিস্ময়-ব্যাকুল।

দেশবাসীর গর্বস্তব্ধতায় নতুন আবেগ-চাঞ্চল্য জাগে যখন তারা জানতে পারে এই সংঘর্ষের উপলক্ষ। যে কয়টা শহরে সংঘর্ষগুলো বেধে ছিল সেগুলোর প্রত্যেকটাতে সন্ত্রাসবাদীরা সামরিক এবং প্রশাসন কেন্দ্রের ওপর যুগপৎ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। অপেক্ষা ছিল মাত্র নির্ধারিত মুহূর্তটির। তারো না-কি বাকি ছিল স্রেফ একটা দিন—চব্বিশ ঘণ্টা।

এ ঘটনার হৃদয়বিদারক বিয়োগান্তক পরিণতি যাঁদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হয়, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কদমতলার রামতনু পুরকায়স্থ, শশাঙ্কের পক্ককেশী পিতা। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ঐ খণ্ডে যে সমস্ত ভারত সন্তান মরে অমর

হয়েছিল তাদের একজন ছিল শশাঙ্ক।

ঐ ঘটনার প্রায় এক মাস অন্তর কদমতলার রামতনু পুরকায়স্থর বাড়িতে আসে এক অজ্ঞাত অতিথি। বছর দুই বয়সের একটি শিশু ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। অতিথিটি প্রথম সুযোগেই রামতনুকে এক খামে আঁটা চিঠি দেয়। গোপনীয়তা আশ্রয়ে। বিস্মিত রামতনু চিঠিখানা খুলেই চমকে ওঠেন, ভুরু কুঁচকিয়ে একটানা ওটা পড়তে পড়তে ব্যথা-বিধ্বস্ত হতে থাকেন, এবং শেষ পর্যন্ত দু-এক ফোঁটা চোখের জলও তাঁর বার্ধক্যদষ্ট গাল বেয়ে টপটপ করে করে পড়তে না দিয়ে পারে না। অতিথিটি ছিল প্রাক-বিংশতি বছর বয়স্ক যুবক। সুশীল সুদর্শন এবং সুশিক্ষিত। সে চিঠিখানা হস্তান্তর করেই রামতনুর দিকে চেয়েছিল। নির্ণিমেষে। তাঁর চোখে জল এসে যাওয়ায় তারও চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে। সে সট করে রামতনুকে একটা প্রণাম করে। একটু কেঁদেও ফেলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। বলে, সাবিত্রীদি বলছিলেন আপনি এ চিঠি অবিশ্বাস করবেন না।

রামতনুর আভিজাত্যবোধ ছিল দুর্বার। তিনি আত্মসংবরণ করে নেন। নীরবে এবং সংযম সুষমায় চিঠিখানা আবার ছেঁড়া খামটাতে পুরে রেখে শিশুটিকে আবার দেখেন। কয়েক লহমা। তারপর ওর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে চলে যান অন্তপুরে। নিজের ঘরে অর্গল-বদ্ধ হয়ে ভাবতে। একা। তিনিও মৃতদার। কিন্তু দোজবর হননি। যে ব্যাপারটা তাঁর সামনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে সে নিয়ে অন্য কারো পরামর্শ নেওয়া ছিল অসম্ভব।

অচিরেই রামতনু চিঠিখানা আবার খুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করেন। এবার এক নিঃশ্বাসে নয়, ধীরে সুস্থে। কলকাতার তারিখ-লাইনের-নীচে লেখা চিঠিখানা ছিল সাবিত্রীর। তাতে যা ছিল তা এই :

"জানি না কথাটা আপনি বিশ্বাস করবেন কি না, কিন্তু এই পত্রবাহকের সঙ্গে যে শিশুটি আসছে সে আপনার পৌত্র। বৈধতঃ নয়, নিসর্গতঃ। এর বাবা শশাঙ্ক, মা আমি, পিতৃদত্ত ডাক নাম খোকা। এর বাবার সাধ ছিল একে মানুষ করার। সে আজ শহীদ। তার সেই সাধ পুরানোর দায়িত্ব ভাগ্য আমার কাঁধে বর্তিয়েছে। কিন্তু আমি ভাগ্যবাদী নই। আমার যা ক্ষমতা তাতে শশাঙ্কর সাধ পূরণ করার সম্ভাবনা সামান্য। তাই ওকে আপনার হেপাজতে সঁপে পাঠাচ্ছি। আপনার ধর্ম আপনাকে যা করতে বলে, করবেন।

"অন্তে আরো একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন মনে করি। খোকা আমার নিরাশ্রয় নয়। আমি বেঁচে থাকতে তার সে দুর্ভাগ্য হবে না।"

সাবিত্রীর চিঠি আবার পড়ে রামতনু আর কেঁদে ফেলেন না। বিচলিতও হন না। তিনি হন সমস্তালাঞ্ছিত। চিঠিখানা তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেছেন। সাবিত্রীর প্রতি তাঁর মনে একটা প্রশংসা-উষ্ণ সহানুভূতিও জেগেছিল।

সাবিত্রী শশাঙ্কর উপপত্নী হয়ে ভেগে গিয়েছিল, এ সন্দেহ কারো মনে উঁকি-ঝুঁকিও মারেনি কোনসময়। ঐ যুগে সন্ত্রাসবাদীদের চরিত্রখ্যাতি হেতু। তারা সবাই হতো ব্রতচারী। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অকাতর আত্মত্যাগ এবং লোকসেবা ছিল তাদের প্রধান যোগ্যতা-শর্ত। শশাঙ্ক ছিল সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যেও একটা উজ্জ্বল আদর্শ! তাকে সবাই ব্রতবীর ভাবতো। দলের কাজে সে প্রায়ই নিরুদ্দেশ হয়ে যেতো। কোন কোন উপলক্ষে মাসাধিক কালের জন্য! কিন্তু সাবিত্রীর নিখোঁজ হয়ে থাকার সঙ্গে শশাঙ্কর দীর্ঘমেয়াদী বহির্ভ্রমণের কোন সংস্পর্শ কেউ দেখেনি। কারণ সাবিত্রীও যে সন্ত্রাসবাদী হয়ে গিয়েছিল, এ খবর কারো জানা ছিল না। দলের প্রাথমিক পর্যায়ের সদস্যদেরও নয়।

সত্যটা জেনে গিয়ে রামতনু এখন মর্মাহত হন না। তিনি যা নিয়ে ভাবতে থাকেন সেটা তাঁর কাছে ছিল ভাগ্যের পরিহাস।

রামতনুর তিন ছেলে চার মেয়ের সর্বকনিষ্ঠ ছিল শশাঙ্ক। তাঁর স্নেহ-পুত্তলিকা। সর্বানুজ বলে নয়, অন্য কারণে। বাড়তি বয়েসে তাকে ভূমিষ্ঠ করতে যেয়েই তার মা প্রাণ হারান। মাতৃহীন শিশুটি তাই তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়ায় প্রয়াত স্ত্রীর শেষ অনুরক্তি-নির্মাল্য। আজ সেই শশাঙ্ক শহীদ, কিন্তু তার একমাত্র বংশধর জারজ!

রামতনু আবার আবেগ-উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। নিজের কোলে সদ্য শহীদ হওয়া শশাঙ্কর বাল্যজীবনের কথা মনে পড়তে থাকে। বাড়ীতে দাসদাসীর অন্ত ছিল না। কিন্তু শিশু শশাঙ্ককে দেখার ভার তিনি রাখতেন নিজের হাতে। পান থেকে চুন খসে যাবার ভয়ে। তার সেই মাতৃহীন শৈশবের বহু স্মৃতি-মধুর খুঁটিনাটি তাঁর মনে পড়তে থাকে। চোখ আবার জলে ভরে ওঠে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া সেই শশাঙ্কর একটি বংশধর থাকার আচমকা খবর আজ ভগবানের সর্বাপেক্ষা বড় আশীর্বাদ হতে পারতো। কিন্তু সেই সংবাদ আজ তাঁর মাথায় ভেঙে পড়েছে অভিশাপ হয়ে। কিন্তু কেন? কোন অপরাধে?

রামতনু শুধু ধনাঢ্য ছিলেন না। সুশিক্ষিত ছিলেন। ইংরেজীতে। যৌবনে ব্রাহ্ম হতে হতে থেমে গিয়েছিলেন—না থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পিতা রামগতি পুরকায়স্থ থেমে যেতে বাধ্য করেছিলেন। সেই থেকেই রামতনু গ্রামবাসী,

বৈষয়িক জীবনের নাগ-প্যাঁচে আত্মবন্দি। কিন্তু বৃহত্তর জগৎ থেকে বিযুক্ত নয়। খবরের কাগজ এবং সাময়িকীর মাধ্যমে যুগস্রোতের খবর রাখতেন। শিশু শশাঙ্কর কথা ভাবতে ভাবতে সদ্য দেখা খোকার মুখখানা তাঁর মনে পড়ে যায়। নির্মল, অসহায়, দুরন্ত-আবছা। কিন্তু তাঁর চোখে আবার জল আসে না। মুখ চিন্তাক্লিষ্ট হয়। ধর্মের কথা তো আছেই। তার ওপর আছে সমাজ এবং পরিবার। সাবিত্রী এই গ্রামেরই গৃহত্যাগিণী কুলবধূ। তাঁরই ভ্রাতৃজায়া। ঘনিষ্ট নয়, স্বগ্রামবাসী জ্ঞাতি ভাই তো! আরো বড় কথা। খোকা যে শশাঙ্করই ঔরসজাত একথা বলতে যাওয়া মানে এক শহীদের স্নিগ্ধ স্মৃতিকে কলঙ্ক-চিহ্নিত করা। লোকচক্ষে। পিতা হয়ে একাজ তিনি করতে পারেন? অন্যদিকে খোকাকে মানুষ করাই শশাঙ্কর একমাত্র সাধ, ওতেই তার মরণোত্তর জীবন আজ সজীব।

সমস্যা-নির্ঘাতীত রামতনু ফিরে যান অতিথিটির কাছে। বলেন, সাবিত্রী তার চিঠিতে লিখেছে তার খোকা নিরাশ্রয় নয়, সে বেঁচে থাকতে খোকার সে দুর্ভাগ্য ঘটবে না। এ কথার মানে কি?

মানে এই যে উনি চাকরী করেন। কলকাতার একটা স্কুলে উনি শিক্ষিকা। ছেলেকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখা তাঁর অসাধ্য নয়।

সে শশাঙ্কর দলে কাজ করে না?

তাও করেন। সেটাই তাঁর প্রধান কাজ। চাকরী করেন আত্মনির্ভশীলতার প্রয়োজনে। উনি খুব স্বাধীনচেতা তো? তাছাড়া দলের দিক থেকেও তাঁর একটা অবলম্বন থাকা প্রয়োজন। মেয়েমানুষ। কলকাতায় নিরবলম্বন থাকার নানা সমস্যা আছে। পুলিশের কথাও।

ও। আচ্ছা, সাবিত্রীই যখন তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে তখন আমি ধরে নিতে পারি তুমি তার বিশেষ বিশ্বাসভাজন এবং আপনজন।

আমিও তাঁদের দলের মানুষ। তিনিই আমাকে দলে এনেছেন। আমার কাছে তিনি গুরুতুল্যা।

তাহলে তুমি আমাকে সব কথা খুলে বল তো। প্রথমতঃ, খোকাকে আমার কাছে না পাঠিয়ে নিজের কাছে রেখে আমার সাহায্য চায়নি কেন? সেটা কি এর চেয়ে শ্রেয় হতো না? মা'র চাইতে পিতামহ কিম্বা খুড়া-জেঠা-পিসীরা বেশী আপন নয়। তাছাড়া গ্রামের চেয়ে কলকাতা শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে অনেক বেশী অভিপ্রেত।

তা ঠিক। কিন্তু শশাঙ্কদার অভাবে সাবিত্রীদির জীবন-সমস্যা কতো ভীষণ

তা বুঝেন তো? এক কাঁধে ছেলে অন্য কাঁধে জীবন-সমস্যা মাথার উপর দলীয় দায়িত্ব। পরিস্থিতিটা আপনিই ভেবে দেখুন।

এসব কথা তোমার নিজের না সাবিত্রীর?

সাবিত্রীদির। প্রয়োজন হলে এসব কথা আপনাকে বলার জন্যে তিনিই আমাকে বলে দিয়েছেন।

সাবিত্রী কি ধরণের স্কুলে মাস্টারী করে? তার তো কোন অ্যাকাডেমিক এডুকেশন নেই। তার বাবা তাকে বাড়ীতে পড়িয়েছিলেন। উনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁর কাছে পাওয়া শিক্ষা মামুলী হয়নি। কিন্তু তার জোরেই তো স্কুলে মাস্টারীর কাজ পাওয়া যায় না! কলকাতায়?

যেখানে সাবিত্রীদি মাস্টারী করেণ সেটা একটা প্রাইভেট স্কুল। পাড়ার কাচ্চা-বাচ্চাদের সুবিধার জন্যে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের দানে ওটা স্থাপিত হয়েছিল। ওদের সঙ্গে শশাঙ্কদার জানাশোনা ছিল। রাজনৈতিক স্তরে। তবে প্রসঙ্গটা যখন উঠেছে, তাই একথাও জানিয়ে দিই। সাবিত্রীদি ম্যাট্রিক পাস করেছেন, শিক্ষকতায় ডিপ্লোমা নিয়েছেন।

তাই নাকি! আচ্ছা, সে সব কথা যাক। খোকার দায়িত্ব আমি নিলাম। তবে সাবিত্রীকে বলো, ওকে আমার দায়িত্বে তার নিজের কাছে রাখবার জন্যে প্রস্তুত হতে। এক্ষুণি, না হোক কিছুকাল পর। সেটা সব দিক থেকেই ভাল হবে।

শশাঙ্ক-সাবিত্রীর সেই খোকাই প্রবীর।

পিতৃহীন প্রবীরের মা'র কাছে ফিরে যাবার সৌভাগ্য হয় না। কদমতলায় রামতনু পুরকায়স্থর হেপাজতে তার স্থান হওয়ার খবর পেয়েই সাবিত্রী আত্মহত্যা করে। এই ভীষণ পদক্ষেপের কারণটা সে জানায় একমাত্র রামতনুকেই। মরবার আগে তাঁর কাছে ডাকে ফেলে যাওয়া এক চিঠিতে সে লিখেছিল :—
"রেবতী অর্থাৎ আমার পূর্বলিখিত পত্রের বাহক ফিরে এসে বলেছে আপনি খোকার দায়িত্ব নিয়েছেন। আপনি নেবেন সে বিশ্বাস আমায় ছিল। আমার বিশ্বাস মিথ্যা হয়নি বলে আমি কৃতজ্ঞ। খোকাকে অদূর ভবিষ্যতে আপনার দায়িত্বে আমার কাছে রাখার যে পরামর্শ নিয়েছেন, তা আমি মানি। গোড়ায় সেটা আমার নিজেরও বাসনা ছিল। কিন্তু এখন আমি মহাযাত্রার পথে। ওকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়াটা সেই প্রস্তুতিরই একটা অঙ্গ ছিল। বস্তুতঃ যখন আপনি এই চিঠি পাবেন তখন আমি অনেকদূর চলে যাব। যে দিকে পা বাড়ানোর ফলে আজ আমাকে এই মহাপাড়ি দিতে হচ্ছে তা ধর্মের পথ ছিল না

অধর্মের, সে তর্কে আমি যাব না। তবে একটা কথা বলে যাব। আমার এই যাত্রার কারণ সন্তাপ বা অনুতাপ নয়। খোকাকে মানুষ করবেন। সে দুঃখে থাকবে না সুখে, সে চিন্তা আমি করছি না। আপনার হেপাজতে সে মানুষ হবেই, এই দৃঢ় বিশ্বাসের তৃপ্তিই আমার এই মহাপ্রস্থানের পাথেয়।"

সাবিত্রীর আত্মহত্যা করার আসল কারণটাও সে জানিয়ে যায় ঐ চিঠিতেই সংযুক্ত করে দেওয়া অন্য অংশে, যাতে কেউ সম্বোধন-চিহ্নিত হয় না। সে লিপি ছিল লম্বা। তবে তার মমার্থ ছিল এই :—

গৃহত্যাগিণী হয়েছিল সে দেশসেবিকা হয়ে। কিন্তু তার আগেই তার আর শশাঙ্কর মধ্যে অনুরতি বন্ধন জন্মে গিয়েছিল। তাই কলকাতায় তার পরিচয় হয় শশাঙ্কর সহকর্মী ও সহধর্মিণী। এবং সে পরিচয়েই তার আশ্রয় হয় এক উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্র পরিবারে। রাজনৈতিক যোগাযোগের দৌলতে। ঠিক ঠিক সব চলতেও থাকে। বিপর্যয় ঘটে শশাঙ্ক শহীদ হলে। বিপ্লব কোনদিনই কাউকে পুরোপুরি পূর্ব সংস্কারমুক্ত করে না, করতে পারে না। শশাঙ্কর মৃত্যু সংবাদ শুনে সাবিত্রী শোকাচ্ছন্ন হয় কিন্তু বৈধব্যবেশ ধারণ করতে পারে না। পূর্বসংস্কারে বাধে, মনে মা-বাবার অকল্যাণ হবার ভয় জাগে। তার আশ্রয়দাতারা অবাক। প্রশ্নোত্তরাদির পর আসল কথা বেরিয়ে পড়ে। সাবিত্রীই সত্যটা প্রকাশ করে। অকপটে, আত্মপ্রান্ত। তার আশ্রয়দাতাদের পূর্ব সংস্কার-মুক্তি ছিল স্রেফ পোষাকী ব্যাপার। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে। সাবিত্রীর স্বীকারোক্তির ঝাঁকানিতে সেটা আবরণমুক্ত হয়। যা এত দিন যাবৎ ছিল শ্লাঘ্য উদারমন্যতা এবং স্বদেশী সমর্থন, এখন তা ব্যভিচার মনে হয়। না, প্রায়শ্চিত্ত-নির্মোচ্য পাপ। পাপস্খালনার্থে প্রায়শ্চিত্ত করাও হয়। কিন্তু তার আগে সাবিত্রীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ঝেঁটিয়ে। পিটুনিও দেওয়া হয় কিছু। রাগের প্রথম উত্তাপে। শিশু প্রবীরের সামনে, তার ভীতিকাতর কান্না উপেক্ষা করে। সাবিত্রীকে পুলিশের হাতে সঁপে দেওয়ার কথাও উঠেছিল। কিন্তু তা থেকে বিরত থাকা হয় সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিশোধ নেওয়ার সম্ভাবনা ভেবে। বিতাড়িতা সাবিত্রী তার এক মেয়ে বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় পায়। শশাঙ্কর অভাবে তার জীবন-সংগ্রামে যে সমস্ত প্রতিকূল শর্ত জন্মে তার বিভীষিকাময় পারম্পরিকতা তার আত্মবল কেড়ে নেয়। যে শশাঙ্কর ছেলেকে সে পেটে ধরেছিল তার মৃত্যুতে বিধবার বেশ ধরার আবেগ-তাড়না কেন তার মনে জাগেনি, সে কথা ভেবেও তার আত্মবিশ্বাস হৃতবল হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

শিপ্রাকে এড়াবার জন্যে খ্যাপা হয়ে বেরনোর সময় প্রবীরের কোন ধারণাই ছিল না সে কোথায় যাবে, কি করবে। কিন্তু রাস্তায় নেমেই তার মনে পড়ে যায় স্মৃতি-নিকেতন বড় রাস্তার ওপর। শিপ্রা যদি সেই মুহূর্তেই এসে যায়, তাকে দেখে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে সে গতিমুখ ফিরিয়ে শহরের বিপরীত দিকে হাঁটতে থাকে। জোর কদমে, যন্ত্রচালিতের মতো। কারণ বড় রাস্তাটার অনেকখানি জুড়ে ডানে কিম্বা বামে যাবার কোন রাস্তা ছিল না।

একটু দূর এগোতেই সে দেখতে পায় একটা শহর-মুখো বাস আসছে। দৌড়ে গিয়ে ষ্টপে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই ওটা এসে যায়। সে ওটাতে লাফিয়ে উঠে পড়ে। তখন ভর দুপুর। বাসটাও দুতলা। তবু বাসে বেশ ভিড়। ওপরের ডেকে যেয়ে দেখে ডান দিকের বেশ কয়টা সিট খালি। কারণ ওটা পশ্চিম দিক। ঢলে পড়ে পড়ে সূর্যের আঁচ ওগুলোতে পড়ছিল। সে ঐ কয়টা সিটেরই একটাতে যেয়ে বসে। এ দিকের সিটে বসা অন্যান্য যাত্রীদের অনুসরণে জানলা বন্ধ করে নয়। ওদিকেই সমুদ্র। যে রুটের বাসে সে উঠেছিল সেটা যায় তার তীর ঘেঁষেই। শহর পর্যন্ত প্রায় পুরো দূরত্বটাই। দুতালা বাসের ওপরের ডেকে জানালার

পাশে বসে সমুদ্র দেখতে দেখতে কোথাও যাওয়া প্রবীরের একটা ভ্রমণ-আনন্দ ছিল। যে কোন সময়, যে কোন মানসিক অবস্থায়। সেদিনও অভ্যেস বশতঃ বেছে নেওয়া সিটে বসেই সে ডান দিকে দৃষ্টিবন্দি হয়। কিন্তু সে দেখে না কিছুই। দৃষ্টির সামনে ভেসে বেড়ায় তার বাল্যস্মৃতি।

রামতনুর আশ্রয়ে প্রথম দু-আড়াই বছর তার ঠিক কি ভাবে কেটেছিল সে ভুলে গিয়েছিল। প্রায় সম্পূর্ণই। মনে ছিল স্রেফ একটা স্মৃতি-রেশ। একটা ভীতি-প্রীতি সংমিশ্রিত আত্ম-অস্তিত্ব ছবি। রামতনু তাকে কোনদিন অনাদর করেন নি। করেন নি তাকে স্নেহ-স্নাতও। তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজন নিবারণ করতেন অম্লানে। কিন্তু তাকে কোলে-পিঠে নেননি কখনো। দুটো মিষ্টি কথাও বলেননি তাকে কোনদিন। তেমনি প্রয়োজনে তাকে শাসন করা হয়েছে কিন্তু মারধোর নয়। তার খাওয়া-খাদ্য পার্থক্য চিহ্নিত হতে দেওয়া হয়নি একটুও। বাড়ির ছেলেমেয়েদের যা যখন এবং যে পরিমাণে দেওয়া হতো তাই তখন সে পরিমাণে সেও পেতো। কিন্তু বেশভূষার কথা হতো ভিন্ন। তাতে তার আর পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পার্থক্য থাকতো। তার জামাকাপড়ে দারিদ্র্য ছায়া ভাসতো না। রামতনু পুরকায়স্থর সঙ্গে কোন প্রকার আত্মীয়তা সম্বন্ধও ফুটে উঠতো না। পরিবারে তার স্থানটা আশ্রিতের। সেটা সবারই মনে হতো, সে নিজেও মনে করতো। একটা কৃপাছায়া তাকে সর্বদা ঘিরে রাখতো। তার নিজের অনুভূতিতেও, অন্যের চোখেও।

প্রবীর যে সাবিত্রীর অবৈধ সন্তান এরকম একটা সন্দেহ গ্রামে দানা বেঁধে উঠছিল। ধাঁধা ছিল রামতনুর বাড়িতে তার আশ্রয় হওয়া সম্বন্ধে। সেটাও পরিষ্কার হয়ে যায় অচিরেই। তার মা'র আত্মহত্যা সম্পর্কে পুলিশী তদন্ত কদমতলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ওতে রাজনীতির গন্ধ থাকায়। সাবিত্রী আর শশাঙ্কর মধ্যে একটা যোগাযোগ থাকার খবরটা তখন বেরিয়ে পড়ে। এবার আন্দাজবাজি হয় যোগাযোগটার প্রকৃতি নিয়ে। অধিকাংশ লোকই তখন মনে করে পালিয়ে যাবার পর সাবিত্রী শশাঙ্কর সাহায্যেই কলকাতায় কাজ পেয়েছিল। ভেগে গিয়ে সাবিত্রী শশাঙ্কর উপপত্নী হয়ে গিয়েছিল কি না, সে সন্দেহ কেউ কেউ করে। কিন্তু রামতনু আগাগোড়া এক কথা বলে যান, "ছেলেটি অনাথ। ওকে এক বন্ধু কলকাতা থেকে আমার কাছে আশ্রয়ের জন্যে পাঠিয়েছে।" এ কথা তিনি বলেন বাইরেও, বাড়িতেও।

প্রবীর নিজে তার অবস্থাটা বুঝতে পারে না। তার চোখে ব্যাপারটা ছিল

একটা ব্যথা এবং ভীতি সংমিশ্রিত ধাঁধা। সে যদি শশাঙ্করই ছেলে তবে সে নিশ্চয়ই রামতনুর পৌত্র। তবে কেন তাকে আশ্রিতের মতো রাখা হচ্ছে, সেটাই ছিল তাঁর ব্যথার কারণ। তার মনে ভয় জাগার কারণ ছিল পাড়ার ছেলেদের কেউ কেউ তাকে যা বলে ডাকতো, সে জন্যে। ঝগড়া-টগড়া বেধে গেলে তো বটেই, এমনিতে ও মাঝে মধ্যেই তাকে "জারজ" বলা হতো। এ শব্দটার অর্থ সে অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতে পারতো না। কিন্তু ওটা যে একটা ভয়ানক ব্যাপার তা সে অনুমান করতে পারতো। আর সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে উঠতো ভীতি-পর্যুদস্ত। মা'র কথা তার একটুও মনে ছিল না। কিন্তু কলকাতায় যে বাড়িতে সে জন্মাবধি ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবার আগে যে ভয়াবহ ঘটনাটা ঘটেছিল তার একটা আবছা স্মৃতি তার অবচেতন মনে স্থায়ীভাবে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। নিজের ওপর পিটুনী পড়তে থাকা অবস্থাতেও আত্মসম্মান বাঁচিয়ে থাকা এক আবছা নারীমূর্তি ছিল সেই স্মৃতির প্রতীক। এই "জারজ" শব্দটার সঙ্গে সেই ভয়াবহ ঘটনার একটা গভীর সংস্পর্শ দেখতে পেতো সে। যখনই তাকে তা বলা হতো, এক অবর্ণনীয়-ভীতি-তাড়নায় বুক তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠতো।

মাঝ-বাল্য থেকে সে "জারজ" শব্দটার অর্থ বুঝতে থাকে। শশাঙ্ক-সাবিত্রীর কাহিনীর আনঙ্গিক অংশটাও। কিন্তু তদ্দিন বাড়িতে এবং গ্রামে তার পরিচয়ে একটা স্বকীয়তা ভেসে উঠেছিল। সরস্বতীর দয়ায়। পড়াশোনায় তার মেধা অসাধারণ দেখা যায়। নিজের মনেও একটা আত্ম-ওজন বোধ জন্মায়। তার জন্ম-বৈচিত্র্যটা নিয়েও সে মাঝে মাঝে ভাবে, কিন্তু দুঃখ করে না, ভীতি নির্যাতিত হয় না। তবে সে যে স্রেফ একজন অনাথই নয়, শশাঙ্ক-সাবিত্রীর অবৈধ সন্তান, সে সম্বন্ধে সে নিশ্চয়ও হতে পারে না।

তার বয়েস পাঁচ বছরে পড়তেই রামতনু তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। তাতে প্রথম মাসিক পরীক্ষাতেই সব বিষয়ে পুরো নম্বর পেয়ে ক্লাসের প্রথম স্থানটা সে কেড়ে নেয়। এবং এক-ই কৃতিত্ব দেখায় সে পরবর্তী সব পরীক্ষাতেই। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

রামতনু প্রবীরের এই কৃতিত্বটাকে গোড়ায় তেমন আমল দেন না। কারণ স্কুলটা ছিল প্রাইমারী এবং স্বগ্রাম অধিষ্ঠিত। তাঁদের গ্রাম বর্দ্ধিষ্ণু, প্রাইমারী স্কুলটিও খুব নিম্নমানের নয়। তবুও। কিন্তু যথাসময়ে নেত্রকোনায় তিন তিনটে হাই-স্কুলের যেটা সবচেয়ে ভাল মনে করা হতো তাতেই ভর্তি হওয়ার পরও

প্রবীর যখন ক্লাসের প্রথম স্থানটাই নিজের দখলে নিয়ে নেয়, তখন তার মেধাকে রামতনু উপেক্ষা করতে পারেন না।

গ্রামবাসীরা তাকে একটু প্রশংসা-কোমল দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেছিল তার মেধাবী হওয়ার খবর বেরোনো মাত্রই। নেত্রকোনার উচ্চমানের হাই স্কুলেও সে প্রথম হতে থাকায় সেই প্রশংসা-কোমল মনোভাবে জাগে স্নিগ্ধ-প্রসাদ। সে যে জারজ, একথা কেউ ভুলে যায় না। কিন্তু সেটাকে তার মেধাশক্তির অসাধারণত্বটাকে কুৎসা কালো করার প্রবণতা কারো মধ্যে আর দেখা যায় না। অন্ততঃ তত নয়।

ইতিমধ্যে তার চরিত্রে ও একটা স্বকীয়তা চিহ্নিত বৈচিত্র্য ফোটে। নিভৃতি প্রিয়তা। গ্রামের সামনেই নদী। বড়। সব ঋতুতেই ওতে নৌকা চলাচল, মাছ ধরা ইত্যাদি নাদেয় কর্মব্যস্ততা, নানা প্রকার মাছ ধরা পাখীর শিকার অভিযান। কোন একটু আড়াল আশ্রিত জায়গায় সে হয় বসে বসে ওসব নদী দৃশ্য দেখে যেতো, নয় চোখে বোজে শুয়ে থাকতো। সুযোগ পেলেই। কেন, তা কেউ জানতো না, বুঝতো না। তবে গাঁয়ে তার এই নিরালা-প্রীতিকে একটা মেধা লক্ষণ মনে করা হতো।

কবে তার মধ্যে এই নির্জনতা-বিলাস জন্মেছিল, কেউ লক্ষ্য করেনি। হয়তো সে নিজেও না। এই পরিস্থিতিতে তার জীবনে ঘটে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।. সে তখন ক্লাস এইট কিম্বা নাইনে পড়ে। একদিন তাকে কাছে ডেকে এনে রামতনু একটা তামার চেনে গাঁথা তামার মাদুলী দেন। মুখহীন এবং আয়তনে বেধড়ক বড়। বলেন, "এই মাদুলিটার মধ্যে যা আছে তা তোমার জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। এর বেশী এ সম্বন্ধে আর কিছু বলব না। ভালো হতো যদি ওটা তোমাকে তোমার উপযুক্ত বয়েসে দিতে পারতাম। কিন্তু আমার বয়েস আশী হতে চলেছে। শরীরটাও আর আগের মত নেই। হঠাৎ মরে গেলে গোল বেধে যাবে। তাই এখনই তোমাকে এটা দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এক আদেশ-আশ্রয়ে। পঁচিশ বছর বয়েস না হওয়া পর্যন্ত ওটা খোল না। আমি মরে গেলেও না। দেখার পর ওর ভেতরে যা আছে তা নিয়ে তোমার যা ইচ্ছে করো। কিন্তু যদ্দিন দেখা হচ্ছে না, তদ্দিন ওটা প্রাণ গেলেও হারিও না। প্রাণ না যাওয়া পর্যন্ত যাতে ওটা হারিয়ে না যায় সে জন্তেই এই মাদুলী এবং চেন। ওটা কোমরে লাগিয়ে নাও। এসো আমি নিজের হাতে লাগিয়ে দিচ্ছি।" চেনটার দু মুখে দুটো আংটা ছিল। একটা

খোলা অন্যটা বন্ধ। এখন বন্ধটার মধ্যে খোলাটাকে জুড়ে দিয়ে মুখে টিপে দিতেই ওটাও বন্ধ হয়ে যায়। তিনি আবার বলেন, "এখন থেকে না কেটে এই চেন আর খোলা যাবে না। ন-দশ বছর কেন, পনের বিশ বছরেও ওটা ক্ষয় হবে না। ভেঙ্গেও যাবে না। আচ্ছা এসো।"

এই ঘটনার বছর খানেকের মধ্যেই রামতনু মারা যান। সামান্য জ্বরে মাত্র তিন চার দিন শয্যাশায়ী থেকে।

প্রবীরের স্মৃতি-স্রোত এখান পর্যন্ত এসে থেমে যায়। বাস গন্তব্যস্থলে যেয়ে পৌঁছে যাওয়ায় কিম্বা অন্য কোন বাহ্যিক কারণে নয়। রামতনু মরে যাবার পর যা ঘটেছিল সে ভাবতে চায় না। মন স্মৃতিক্লান্ত হয়ে ওঠে। তার সেই জীবনপট যেমন বিবর্ণ এবং নীরস তেমনি নিদারুণ এবং গতানুগতিক। লক্ষ লক্ষ হতভাগাদের কৈশোর-চিত্র হুবহু এই। তখনো ছিল, এখনো আছে। রামতনু যখন মারা যান তখন তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় হয়ে এসেছিল। তবু সে নন-ম্যাট্রিক। কারণ তাঁর অভাবে কদমতলার বাড়িতে তাকে আর থাকতে দেওয়া হয় না। অভিমান-ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রাম থেকে চলে আসার পর তিন চার বছর তাকে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছিল তা গতানুগতিক, তা দুর্বিসহ। তবে তারই ফলশ্রুতি সাফল্য-প্রসাদিত সাংবাদিকতা। বোম্বেতে সে "দ্যা এরিনা"র স্বীকৃত-প্রতিশ্রুতির সহ-সম্পাদক। কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ হবার পর যা ঘটে তা-ই হয় তার সর্বাপেক্ষা সত্ত্বা ঝাঁকানো অভিজ্ঞতা। তখন সে রামতনুর দেওয়া ঐ মাদুলীটা খোলে আর তাতে থাকে রামতনুর কাছে লেখা সাবিত্রীর দুটো চিঠি। তাতে তিনি লিখে রেখেছিলেন; "শশাঙ্ক আমারই কনিষ্ঠ পুত্র। সাবিত্রী যা লিখেছে তা সত্য। আমি তদন্ত করে দেখেছি।"

॥ দুই ॥

প্রবীরের বাস যথাসময়ে যেয়ে থামে ফ্লোরা ফাউন্টেনে। সেখানেই ও রুটের টার্মিনাস। সেখানে নেমে সে হাঁটতে থাকে। লক্ষহীন, হত-সংবিত, স্মৃতি-বিভোর। মা-বাবার স্পষ্ট কোন স্মৃতিই তার মনে নেই। মাকে পিটুনী খেতে দেখার কল্পনা-স্মৃতিটুকু ছাড়া। প্রাক-যৌবনের স্মৃতিপট জুড়ে আছে

রামতনুর বার্ধক্য-মূর্তি। সুষ্ঠুদেহ সৌম্যদর্শন জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা মুগ্ধ। অতীত পটের বাকি অংশ বর্ণহীন। বাল্যমাধুর্য কিম্বা কৈশোর-স্বপ্ন ওতে কোন রঙের ছোপ ছোঁওায়নি।

রামতনু তাকে মানুষ হবার সব সুযোগ দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তার বাবার বাসনাও ছিল তাই। এবং সেটা যাতে পূরণ হয় সে অভিপ্রায়েই তার মা তাকে তার "পিতামহ"র হাতে সঁপে দিয়েছিল। রামতনু মারা যাওয়ায় তার মা-বাবার সেই আশাসৌধ ধসে পড়ে। কিন্তু সেই দুর্ভাগ্য-ঘা তাকে হৃত — উদ্যম করতে পারে নি। সর্বপ্রকার প্রতিকূল শর্তের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে থেকে সে সাফল্য সোপানে পা রেখেছে। কিন্তু তার মানুষ সত্তা? তার মা-বাবা তার মধ্যে যা জাগাতে চেয়েছিলেন? যা জাগানোর জন্যে রামতনু চেষ্টা করে গেলেন তার কতটুকু তার মধ্যে জেগেছে? আর সেই মানুষ সত্বাটাই বা কি? তার জন্ম অবৈধতা দুষ্ট করায় তার মা-বাবা কি তাঁদের মানুষিকতা-বোধ স্তিমিত-প্রভ করে গেছেন?

সে জারজ। জীব-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে জারজ হওয়া ক্ষতিকর কিছুই নয়। সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে ব্যাপারটা জটিল। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, জারজ হতে কেউ চায় না। ভারতে নয়। এখানে যে জারজ তাকে এবং তার রক্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকে সমাজ বিদ্রূপ-আশ্রিত নজরে দেখে, ঘৃণা দেখায়, টিটকারি লাঞ্ছিত করে, এমন কি জাতে ঠেলে। যে জারজ সে নিজে আজীবন হীনমন্যতায় ভোগে, তার মুখ আত্মসচেতনতা—মলিন হয়, আত্মপরিচয় দিতে যেয়ে সে ফাঁকির আশ্রয় নেয়। সে নিজেও তা-ই করেছে। তার বাবা শহীদ, মা ছিলেন রণরঙ্গিণী। কিন্তু এ খবর সে লুকিয়ে রাখে, বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ায় না। তার জারজ হবার কথাটা বেরিয়ে যাবার ভয়ে। অথচ এমন একটা বিশ্রী জীবন-শর্তের উৎপত্তিতে কারো নিজের কিছুই করবার থাকে না। কারণ জন্মের বৈধতা-অবৈধতা নির্ধারিত হয় জন্মানোর দশ মাস পূর্বে।

কিন্তু অবৈধ প্রণয় বন্ধন কি সব ক্ষেত্রেই এক? সমাজে গা-সওয়া হয়ে যাওয়া এক রঙ্গিণ ব্যভিচার? এতে কি একটা বিদ্রোহ-বহ্নি কিম্বা তার ফুলুঙ্গি লুকনো থাকে না? অনেক ক্ষেত্রেই! যথা তার নিজের মা-বাবা?

সেদিন সে উদ্দেশ্যহীন হয়ে কতো জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে, মাঝে মাঝে ক্লান্তি-বিবশ হয়ে কোথায় কতক্ষণ বসে কাটিয়েছে, সে জানে না। বাড়ি ফেরার পথে যখন সে একটা সাবার্বান ট্রেনে চড়ে বসে তখন রাত দশটা, যে ষ্টেশনে ওটা

ধরে তার নাম মহালক্ষী। ওটার পশ্চিমে প্রথম ঘোড়দৌড়ের মাঠ, তার পরই সমুদ্র। কিন্তু সমুদ্র তীরবর্তী মহালক্ষী মন্দির থেকে টার্ফ ক্লাবের পেছন দিয়ে এবং অন্য একটা অতি-অভিজাত ক্লাবের উপবন-ছাওয়া সম্মুখ চত্বর ঘেঁষে যে প্রশস্ত রাস্তাটা মহালক্ষী ব্রীজ হয়ে মহালক্ষী ষ্টেশন ছুঁয়ে একটা প্রসিদ্ধ সিনেমা ইষ্টুডিও ডান ধারে রেখে ওয়ার্লি সমুদ্র সৈকতের দিকে চলে যায়, সেটা যেমন বৃক্ষছায়া প্রশান্ত তেমনি জন এবং জান বিরল। ফ্লোরাফাউন্টেন থেকে বীর নরীম্যান রোড ধরে মেরিণ-ড্রাইভ দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলে সমুদ্রের কিনার বেশী না ছেড়েও মহালক্ষী মন্দির পর্যন্ত যাওয়া যায়। ইচ্ছে করলে, মাঝে মধ্যে এক বাঁকে কয়েক মিনিটের পথ একটু দূর দিয়ে যেতে আপত্তি না থাকলে। প্রবীর যখন ফ্লোরা ফাউন্টেনে নেমেছিল তখন দুপুর একটা কি দেড়টা। মহালক্ষী ষ্টেশনে যখন সে ট্রেন ধরে তখন রাত দশটা। আট ঘণ্টা সাড়ে আট ঘণ্টা সে হেঁটেছে। মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে। ঐ পথে ফ্লোরা ফাউন্টেন থেকে মহালক্ষী ষ্টেশন কমের পক্ষেও আট-ন-মাইল।

তার বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাড়ে দশটা বেজে যায়। সেখানে ক্ষুধা—উৎপীড়িত সহ-অধিবাসীরা তার অপেক্ষায় বসে আছে। কিন্তু তার প্রত্যাবর্তনে তিনজনের মুখই ঔৎসুক্য-উত্তেজিত। কোথায় গিয়েছিলি, কানু জিগ্যেস করে, প্রবীরের ওপর অনুমান-তৎপর দৃষ্টি রেখে।

একটু ঘুরে বেড়াতে? বাড়িতে একা একা ভাল লাগছিল না।

একা একা! তবে শিপ্রা এসেছিল কেন?

শিপ্রা আবার কখন এসেছিল? প্রবীরের মুখে চোখে বিস্ময় বিহ্বলতার অভিনয়-প্রয়াস।

কেন, দুপুরে। এখানে দরজায় তালা ঝোলানো দেখে ও ওপরে তোর খোঁজ নিতে গিয়েছিল। কানু একটা কথা এখানে বাড়িয়ে বলে। শিপ্রা ওপরের ফ্ল্যাটে তার নামধাম রেখে গিয়েছিল না। কানু সেটা অনুমানে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু প্রবীরের সে খেয়াল হয় না। শিপ্রা এসে ঘুরে যাবার খবরটা শুনে সে দুপুরে যা ঘটানো হয়ে গেছে তার জটিলতা কি, এতক্ষণে দেখতে পায়। তাকে নীরব দেখে কানু আবার বলে, ব্যাপারটা কি খুলে বল তো? তাড়াতাড়ি খিচুড়ি রান্না করিয়ে নিয়ে অম্বাকে পাঠিয়ে দিলি সিনেমা দেখতে। এ পর্যন্ত জিনিষটা বেশ পরিষ্কার। শিপ্রার সঙ্গে নিভৃতি—মিলনের প্রস্তুতি। কিন্তু তারপর তুই হঠাৎ বেরিয়ে গেলি কেন? তৈরি খিচুড়ি অস্পৃষ্ট রেখে? শিপ্রা

আসছে না দেখে অধৈর্য হয়ে? বাইরে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় বাড়ি না ফিরে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলি? বল না কি হয়েছে? চুপ করে আছিস কেন? কানুর মুখে তার সেই ধূর্তামী-মধুর ছেলেমানুষী হাসি।

প্রবীর নির্বাক, তার মুখে শিলীভূত বিস্ময়। দুপুরে যা হয়েছে তার অর্থ যে কানু যা করেছে তাই হতে পারতো, সে খেয়াল তার একবারও হয়নি। এর আগে।

তার ভেবাচেকা খাওয়া অবস্থা দেখে অন্য তিনজন হেসে বাঁচে না। সুরেশ কৃত্রিম গাম্ভীর্যে প্রবীরের হয়ে কানুর সঙ্গে ওকালতি করে। এটা তোর পক্ষে অন্যায়, কানু। যে কথাটা তুই জানতে চাচ্ছিস সে কথা কোন ভালমানুষ ঢাকঢোল পিটিয়ে বলে বেড়ায়? যা, প্রবীর তুই এবার কাপড় ছেড়ে নে। তোর মুখটা বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে। আমাদেরও ক্ষুধা পেয়ে গেছে।

যদিও প্রভা প্রবীরের সঙ্গে কথাটথা বলতো কম, এখন সে'ও হেসে ফেলে গুজরাটীতে কি একটা মন্তব্য করে আর অমনি কানু এবং সুরেশ আবার হো হো করে হেসে ওঠে। প্রভা বলছে, তোকে দেখে মনে হয় তুই আপন ভোলা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তুই ডুবে ডুবে জল খায় মানুষদের একজন,—সুরেশ প্রভার মন্তব্যটা ইংরেজীতে তরজমা করে প্রবীরকে বলে।

প্রবীর প্রতিবাদ করতে যেয়েও থেমে যায়। তার মন অবসন্নতা কাতর হয়। তার একটা বিষণ্নতা-ম্লান অভিজ্ঞতার যে কদর্য ছবি অন্যের চোখে ফুটে উঠেছে তাতে সে বিস্ময়-স্তব্ধ, অবসন্নতা-ক্লিষ্ট। সে শুধু বলে, আমি একা একাই ঘুরে বেড়িয়ে এসেছি।

যা যা ন্যাকামো ছাড়। আচ্ছা যেতে দে ও প্রসঙ্গটা। তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে আয়। খেতে বসব এবার। ক্ষুধায় পেট জ্বলছে, কানু বলে।

অপরিসীম ক্লান্তি সত্ত্বেও সে রাতে প্রবীর অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমুতে পারে না। তবে অনিদ্রার কারণ দুপুরে ঘটা ব্যাপারটার যে কদর্য অর্থ করা হয়েছিল, তা নয়। শিপ্রার কথাও না। দুপুরে সে ওকে শুধু এড়িয়ে যাবার জন্যেই ব্যগ্র ছিল। তাকে বাড়ীতে না পেয়ে ও কি ভাববে না ভাববে সে প্রশ্নই তার মনে জাগে নি। এখনো জাগে না।

শিপ্রার সঙ্গে তার ব্যবহার বৈপরীত্য-ধর্মী বলে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমবার একত্রে সিনেমা দেখতে যাবার প্রস্তাবটা সে-ই করেছিল। শিপ্রাকে রাজী করানোর জন্যে অনেক বলা-কওয়া এবং কান্দর্পিক শৈলীর প্রয়োগ করতে

হয়েছিল। অথচ শেষ পর্যন্ত ধার্য সিনেমা-সূচী পণ্ড করে দেয় সে নিজেই। আচমকা, জরুরী কাজ হাতে এসে পড়ার অজুহাতে। ঐ উপলক্ষে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল শিপ্রা। কিন্তু ওটার মর্মার্থটা অনুক্ত রেখে নয়। তুমিও দেখছি নিজের মন বোঝে না মানুষদের একটি, সে প্রবীরকে বলেছিল। হাসতে হাসতে, কিন্তু মন্তব্যটাকে তাৎপর্য-ভ্রষ্ট হতে না দিয়ে। তারপর প্রবীর নিজের মন বুঝতে না পারার উদাহরণ ঘটিয়েছে বহুবার। প্রতিক্রিয়ায় শিপ্রা কখনো হেসেছে, কখনো রেগে গেছে—মাঝে মাঝে প্রবীরের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া যাই হোক, তাদের বন্ধুত্ব বন্ধন আঁটুনি-মধুর হয়ে চলেছে। অনির্বাণ। তার আত্ম-খণ্ডন চিহ্নিত ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া কখনো আর কিছু হতে পারে, এ সম্ভাবনা প্রবীরের মনে জাগতোই না। সেদিন দুপুরেও জাগেনি।

বাড়ি থেকে সে পালিয়ে গিয়েছিল একটা তাৎক্ষণিক উত্তেজনায়। অম্বা উক্ত তার প্রশস্তি যার উৎপত্তি-হেতু ছিল। তার মন কোমল; সে অন্যের ভাল করতে পারলে করবে, মন্দ কক্‌খনো না; তার মধ্যে সাচ্চাইপনা আছে, ইনসানিয়ত আছে; ইত্যাদি অম্বার মুখ-নিসৃত মন্তব্যগুলো তাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে গিয়েছিল। দারুণ। জীবনে নিজের সম্বন্ধে বহুবিধ মন্তব্য তাকে শুনতে হয়েছে। প্রাক-যৌবনে পরাশ্রিত অবস্থায়, আত্মনির্ভরশীল স্বচ্ছন্দ জীবনেও। তার মধ্যে একটা আলাদাপনা আছে; তার ব্যবহার বৈপরীত্যধর্মী; সে খুব আত্ম-সমাহিত; ইত্যাদি তার বন্ধুরা তাকে অহরহ বলতো, এখনো বলে। অম্বাই প্রথম একজন যে তার হার্দিক গুণাবলীর স্তুতিগান গেয়ে শোনায় তাকে। মন্তব্যগুলোর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সে হেসেছিল। কিন্তু অম্বার কৃতজ্ঞতা উদ্দীপিত মুখের দিকে চাওয়া মাত্রই তার মনে লাগে সেই দারুণ ধাক্কাটা।

প্রথমত সে কেবল চমকে উঠেছিল। ভেবেছিল অম্বার অবৈধ প্রেমের গভীরতা কত স্নিগ্ধ, কত কোমল! কিন্তু অম্বা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর তার চিন্তাধারা পালটে যায়। আস্তে আস্তে। তার মনে হয়, অম্বার কৃতজ্ঞতা-উষ্ণ স্তুতিবাদে কি যেন একটা নিখোঁজ জীবন-তথ্যের সঙ্কেত রয়েছে। কিন্তু সেটা কি? মনুষ্য-সত্তা বলতে তার বাবা-মা যা বুঝতেন তা-ই? সে চিন্তা-উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে, আরম্ভ করে ঘরে পায়চারী করতে এবং শেষ পর্যন্ত, অম্বা সিনেমা দেখতে যাওয়ার পর, সে নিজেও বাড়ি থেকে যায় বেরিয়ে। কিন্তু তার অনুসন্ধান—উত্তেজিত চিন্তাধারা থাকে অব্যাহত।

সে চিন্তাধারা অব্যাহত থেকেছে সেদিন প্রহর-দুই ব্যাপী, এখানো আছে। কিন্তু বৃথা। অম্বার কৃতজ্ঞতায় যে জীবন তথ্যের একটা ঝলক দেখেছিল তা শশাঙ্ক কল্পিত মনুষ্য সত্বার সারবস্তু মনে হয় না তার। আদৌ না। পরোপকার পরম ধর্মই। কিন্তু এ যুগে যে সব ধর্মই স্বার্থসিদ্ধির উপায়! এই পরম ধর্মটিও!

গাছ আগে না বীজ আগে, এ বিতর্কের শেষ নাই। কোনদিন হবে কিনা কেউ জানে না। কিন্তু গাছ ছাড়া বীজ অসম্ভব এবং বীজ ছাড়া গাছ। তেমনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে পরোপকার জড়িত। একটা ছাড়া অন্যটার অস্তিত্ব অকল্পনীয়। নেহাৎ-ই বোকা ছাড়া কেউ কারো উপকার করে না, উপকৃত হয়ে কৃতজ্ঞ হয় না। তার শহীদ বাবা কি তাকে সে ধরণের মানুষ হতে দেখতে চেয়েছিলেন? ভুঁদো হতে?

সে হয়তো পারলে মানুষের উপকার করবে, অপকার কারো নয়। কিন্তু সেটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। মানব সত্বার পরিচয় নয় নিশ্চয়ই। মনুষ্যত্ব সত্বার জন্মদাতা সভ্যতা-নির্ভর আত্ম-সংগঠন প্রচেষ্টা, প্রকৃতি নয়।

রামতনু প্রদত্ত সেই মাদুলীটা খুলে দেখার পর প্রবীর কতবার যে এই সমস্যাটা নিয়ে ভেবেছে তার হিসেব নেই। কারণে অকারণে সে গুম হয়ে ভেবে গেছে, তাকে মানুষ করতে চেয়ে শশাঙ্ক ঠিক কি বুঝতেন? তার আলাদাপনা, বৈপরীত্য-চিহ্নিত ব্যবহার, আপন-ভোলামী, ইত্যাদির মূলে ছিল এই জিজ্ঞাসা তাড়না। কিন্তু বহুবার আগেও যেমন হয়েছিল তেমনি সে রাত্রেও তার চিন্তা সমাধি নিষ্ফল হয়।

॥ তিন ।

শিপ্রার সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়ে গেছে তাতে ও কি মনে করছে, তা নিয়ে প্রবীর ভাবতে আরম্ভ করে পরদিন বাসে চড়ে অফিসে যাবার পথে। ভাবতে বসে সে খুব অনুতপ্ত হয়। এপ্রিল মাস। কি গুমসো গরম! তবু ভর দুপুরে সাত-আট মাইল রাস্তা বাস ভ্রমণের ঝঞ্ঝাট পোহায়ে এসে ও ঘুরে গেছে। অফিসের কাজ কামাই করে! কি দারুণ অন্যায়!

সঙ্গে সঙ্গে তার মনটা এক নতুন আনঙ্গিক সুখে গদগদ হয়ে ওঠে। আমার

প্রতি ওর টান নিশ্চই গভীর, গভীরতা স্নিগ্ধ। অম্বার কৃপাভাজনটির প্রতি অম্বার টানের মতো! নইলে কি অমন করে ও আসতো?

অফিসে যেয়েই প্রবীর শিপ্রাকে ফোন করে। পায় ভীষণ আঘাত। আওয়াজ থেকেই প্রবীরকে চিনতে পেরে শিপ্রা বলে, কাল আমার সঙ্গে তুমি তামাসা করেছিলে না-কি? তার স্বরে বরফ-জমানো শৈত্য।

কি রকম? থতমত খেয়ে প্রবীর জবাব দেয়।

কি রকম কি? আমাকে আসতে বলে তোমার বাড়ির দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে যাওয়ার অর্থ তুমি বোঝ না? শিপ্রার স্বরে এখন বিতৃষ্ণা-বিষের ছোবল।

প্রবীরের তাৎক্ষণিকতা-উর্বর বাকপটুতা অকেজো হয়ে যায়। সে অবাক হওয়ার ভান করে বলে, বারে! তুমি পরশু বার বার বললে তুমি আসতে পারবে না। কি করে আমি বুঝব তোমার না-ই হ্যাঁ?

ইউ'র অ্যান ইডিয়েট—অ্যা কনজেনিট্যাল ইডিয়েট। বলে শিপ্রা ধপাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখে।

শিপ্রার স্বর-নিঃসরিত বিতৃষ্ণা-বিষের ঝাঁজ প্রবীরের কানে রি-রি করতে থাকে। সে তার হাতের রিসিভার নামিয়ে রাখতে ভুলে যায়। ওটা যে তখনো তার কানে চেপে ধরানো আছে, সে কথাই যেন তার আর মনে থাকে না।

কিন্তু আফিসে তখন ভীষণ কাজের তাড়া। প্রেস থেকে একটা প্রুফ নিয়ে আসে সিপাই। হুঁশ ফিরে পেয়ে প্রবীর ডুবে যায় কাজে। তবু কাজের ফাঁকে ফাঁকে মন তার বিষণ্ণতা-ভারী ঠেকে, ভরে ওঠে এক অশ্রু সজল শূন্যতায়। থেকে থেকে তার দম যেন আটকে যাচ্ছে মনে হয়। বৈকালিক কাগজ। অপরাহ্নের দিকে কাজের তাড়া ধাঁ করে কমে যায়। তার ফুরসৎ-বন্দি মন আরো বিষণ্ণতা-স্তব্ধ এবং শূন্যতাক্লিষ্ট হয়।

বাল্যাবধিই তার ব্যক্তি-জীবনের প্রধান বৈচিত্র্য শূন্যতা। শুষ্ক—নির্বর্ণ—নিঃসীম। জীবন-পটের এই মরু ধূসর একঘেঁয়েমিতে ছেদ ঘটায় যৌবন। দুর্ভাগ্য তখন থেকে আর একটা সত্ত্বা-নিষ্পেষণ শর্ত নয়, সংগ্রাম-প্রেরণা। প্রতিশ্রুতিধর সাংবাদিকতা যার ফলশ্রুতি। সেই যৌবন প্রভাতও ছিল নিঃসীম শূন্যতা এবং নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গম। তবে সেই সংগ্রাম-বন্দি জীবন ছিল অপার রোমাঞ্চ সুখের উৎস। যদিও জীবন থেকে গিয়েছিল এক ধূসর শূন্যতাই। আবাল্য যেমন ছিল। সেই শূন্যতার নির্বর্ণ এবং নীরস নিঃসীমতাকে সোনালী

করে তোলে শিপ্রা। বাঁচার আনন্দ যে কত পার্থিবতা-মধুর হতে পারে তার পূর্ব-স্বাদ ও তাকে দেখিয়েছে। আর আজ সেই শিপ্রার বন্ধুত্ব-বন্ধন থেকেও সে ছিটকে পড়েছে। না, এটা সে হতে দেবে না। শিপ্রার অনুরক্তি বলয় থেকে ছিটকে সে পড়বে না। ওকে আঁকড়ে ধরে রাখবে। নাকচ-হয়ে-যাওয়া প্রেমিকের হীনমন্যতার আশ্রয়ে নয়, কৃতজ্ঞতা-কোমল প্রণয় প্রয়াসের জোর খাটিয়ে। শিপ্রাকে সে ভালবাসে। ভালবাসা পার্থিবতা-ক্লিন্ন জীবনের অনাবিল অংশ। এর মাধুর্যে উত্তেজনায় কিম্বা প্রাপ্তি-সুখে কোন খাদ নাই, থাকতে পারে না। ভালবাসা সাচ্চা হলে। তার মনে শিপ্রার প্রতি যে ভালবাসা জন্মেছে তা সাচ্চা।

পাঁচটা বাজতেই সে ছুটে যায় অজন্তায়। শিপ্রা সেখানে মজুত। তবে স-সঙ্গী। প্রবীর থমকে যায় না। এমন হতোই। তারা দুজনের যে আগে আসতো সে সেখানে বিশেষ পরিচিত কাউকে দেখতে পেলে তার সঙ্গে ভিড়ে যেতো। কিন্তু তারা দুজনের দ্বিতীয় পক্ষটি এসে গেলেই তৃতীয় পক্ষটি কনুই-ঠেলা খেতো। সেদিন প্রবীরকে দেখে শিপ্রা তার সঙ্গীটিকে কনুই ঠেলা দেয় না, দেবার কোন ইচ্ছা দেখায় না। শুধু তাই নয়, প্রবীরের প্রতিই তার মনোভাবে কনুই ঠেলার খোঁচা ফোটে।

প্রবীর এবার থতমত খেয়ে যায়। তার মনে এই সাক্ষাৎকারের পূর্ব-কল্পনায় এরকম পরিস্থিতির সম্ভাবনা-ছায়া স্থান পায়নি। অভিজ্ঞতা আকস্মিক। তার বুদ্ধিসাম্য হারিয়ে যায়। যে হীনমন্যতা সে বুক ফুলিয়ে এড়িয়ে যাবে ভেবেছিল তারই আশ্রয় নিয়ে সে বলে, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল, শিপ্রা।

তাই না-কি? বড্ড আপসোসের কথা হলো তো! এখন আমার এর সঙ্গে জরুরী কথা আছে। শিপ্রা মাথা হেলিয়ে তার সঙ্গীটিকে দেখায়।

শিপ্রার সঙ্গীটি অপ্রস্তুত হয়। সেও একজন সাংবাদিক। বড়। একটা মুখ্য জাতীয় দৈনিকের বোম্বে করস্পণ্ডেন্ট এবং একটি সুবিদিত বিলিতি কাগজের সর্ব-ভারতীয় প্রতিনিধি। নাম এ. পি. দীক্ষিত, বন্ধুদের কাছে "ডিকী"। বয়েস, পদমর্যদায় এবং আর্থিক আয়ে প্রবীরের চেয়ে সে বেশ বড়। কিন্তু নামে প্রবীরই বেশী খ্যাত। বোম্বেতে। দুজনের মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ। "ডিকী" শিপ্রাকে বলে,—শোন্, আমাদের আলোচনাটা অন্য এক সময় হবে। এখন আমার হাতেও একটা কাজ আছে। ঠিক আছে? "ডিকী" শিপ্রার পিঠে আলতো চাটি মেরে প্রবীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে "বাই বাই, বিগ বয়" বলে বেরিয়ে যায়।

শিপ্রারও মনে পড়ে যায় তার আর প্রবীরের মধ্যে পেশাগত সম্বন্ধটার কথা।

সে সুর পালটিয়ে আক্ষেপ করার ভঙ্গীতে বলে, "ডিকী"র সঙ্গে আমার একটা বিশেষ জরুরী কথা ছিল। যাক্, কি বলছিলে?

প্রবীরের ঘা-খাওয়া আত্মপ্রত্যয় ফিরে আসে। সাচ্চা প্রেমের মহিমায় নয় পেশাগত প্রাধান্য-অনুভূতির দৌলতে। সে বলে, কাল দুপুরে যা হয়ে গেছে সে জন্যে আমি যে কত দুঃখিত, লজ্জিত, অনুতপ্ত, তা তুমি নিশ্চয় জান। কেন তবে তুমি ওটা নিয়ে এতো সব বিশ্রী কাণ্ড-কারখানা করছ বলতো? ফোনে আমাকে যা-তা বলেছ, আমাব কথা শেষ হবার আগেই খট্ করে লাইন কেটে দিয়েছ। এখনো আমাকে একজন তৃতীয় পক্ষের চোখে খেলো করার চেষ্টা করেছ। ফোনে যা করেছিলে সেটা অন্য কথা। তার কোন সাক্ষী ছিল না। কিন্তু এই রেস্তোরাঁতে যা করেছ, তাতে তোমার ওজনও খানিকটা কমে যায়নি? কাল দুপুরে কি হয়ে গেছে তা কেউ জানে না। কিন্তু তুমি যে আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু সে খবর কে না রাখে? সাংবাদিক মহলে? এই রেস্তোরাঁর লোকেরাও মনে করে আমবা দুজন বিশিষ্ট বন্ধু। এখন যা তুমি করলে তাতে মানুষ কি ভাববে?

প্রবীরের তিরস্কার উদ্দেশ্য অব্যর্থ হয়। শিপ্রার হাবভাব এখন আর বিতৃষ্ণা বিষাক্ত নয়, নালিশ-ক্ষুব্ধ। কাল তুমি আমার সঙ্গে যা করেছ এমন কেউ কারো সঙ্গে করে? এই মাঝ এপ্রিলের ভর দুপুরে রৌদ্র তাতা হয়ে ছুটে যাই তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে—তাও অফিস কামাই করে; আর তুমি? তুমি বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে সরে পড়। আমার জন্যে একটা নির্দেশ বার্তা পর্যন্ত রেখে যাও না। জান, তোমার দেখা না পেয়ে আমি তোমাদের ওপরে থাকে লোকদের কাছে খবর নিতে গিয়েছিলাম। তারা আমাকে জানালো আমার ওখানে যেয়ে পৌছনর মিনিট দশেক আগে তোমাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। এখন তুমিই বল, এমন কি কাজ হঠাৎ তোমার সামনে এসে গিয়েছিল যে তুমি আর দশটা মিনিট বাড়িতে থাকতে পারলে না?

কিন্তু আমি তো বাড়ি থেকে কাজের জন্যে বেরিয়ে যাইনি। অফিস থেকে ছুটি নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। তুমিও আসবে না বলে দিয়েছিলে। ফাঁকা বাড়িতে ভাল লাগছিল না, বেরিয়ে গিয়েছিলাম। প্রবীর লক্ষ্য করে না "সাচ্চা প্রেমের" তাড়নায় সে মিথ্যে কথা বলছে।

কেন মনে করলে আমি আসবো না? আসতে বলার সময় কি রকম জুলুমবাজী ফলিয়েছিলে মনে ছিল না? শিপ্রার চোখ ছলছল করে ওঠে।

শিপ্রার অভিযোগ-উচ্ছ্বাস কান্নায় এসে ঠেকায় প্রবীর বিচলিত। চল, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। এ আলোচনার উপযুক্ত স্থান এ রেস্তোরাঁ নয়। প্রবীর দাঁড়িয়ে যায়। দরদ-সন্তপ্ত হয়ে। চল অন্য কোন রেস্তোরাঁতে যেয়ে বসি।

শিপ্রা বশ্যতা-নম্র রাজীপনায় প্রবীরের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কিন্তু পেভমেন্টে এসেই বলে, শোন, আমি এখন বাড়ী চলে যাব। আমার ভাল লাগছে না।

তাহলে চল আমিও বাড়ী ফিরে যাই। শিবাজী পার্ক পর্যন্ত বাসে একত্রে যাওয়া যাবে। চাও তো একটা ট্যাকসিও নিয়ে নিতে পারি।

শিপ্রা আঁৎকে ওঠে। না না, আমার একা থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। বিকেলটা যদি ফাঁকা ঠেকে, একটা সিনেমা-টিনেমা দেখে নাও। কাল বিকেলে দেখা হবে। এখানেই। ঠিক আছে?

শিপ্রাকে ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে হয় না প্রবীরের। কিন্তু জেদাজেদি করার সাহসও হয় না। অগত্যা সে বলে, তাহলে চল তোমাকে বাস স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

না না, কোন দরকার নেই। আচ্ছা আমি এখন আসি।

উপায় নেই। শিপ্রাকে প্রবীরের ছেড়ে দিতেই হয়। পরের দিন বিকেল পর্যন্ত। তখনো সে অজন্তার সামনে দাঁড়িয়ে, শিপ্রার ছন্দ-বন্দী পশ্চার্ধ-সুষমা চোখ দিয়ে গিলে যেতে যেতে। একবার তার ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে শিপ্রার সঙ্গ নিতে। ওর আপত্তি উপেক্ষা করে। কিন্তু মনে পড়ে যায় শিপ্রার বিতৃষ্ণা বিষাক্ত ব্যবহারের কথা। না, ওটার পুনরাবির্ভাব সহা যাবে না। তার চাইতে একটা ফাঁকা বিকেলের একঘেয়েমী বরদাস্ত করা অনেক ভাল।

একটা নিঃসরণোন্মুখ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চেপে দিয়ে প্রবীর হাঁটতে থাকে। বাস স্টপের দিকে নয়, বেক-বের দিকে। অজন্তা থেকে সেটা খুব দূর ছিল না।

হাঁটতে হাঁটতে সে ডুবে যায় শিপ্রা-চিন্তায়। ওর সঙ্গে তার ব্যবহার কোনদিন নিখুঁত হয়নি। প্রথম পরিচয় উপলক্ষ থেকে। "অ্যারীনাতে" প্রবীরের সহ-সম্পাদকতা ছিল বহু-দায়িত্বশীল। সম্পাদকীয় লেখা ছাড়া তার জিম্মায় ছিল একটা সাপ্তাহিক কলম এবং সিনেমা সহ ললিতকলা সমালোচনার অনেকাংশ। বিশেষজ্ঞতা-চিহ্নিত হতো বলে তার নামে যে লেখাই বেরত পাঠক-প্রিয় হতো। ফলে অনুষ্ঠানাদিতে তার ডাক পড়ত বিস্তর। শিপ্রার সাংবাদিকতায় তখন সবে মাত্র হাতে খড়ি, কিন্তু তার লেখাও পাঠক-প্রীতি লাভ করেছিল। তারও অনুষ্ঠানাদিতে ব্যক্তিগতভাবে ডাক পড়তো। যদিও ওসবে

যাওয়া তার দায়িত্বের একটা অংশ ছিল। ফলে দুজনকেই দেখাদেখি সীমায় আসতে হতো কার্যব্যপদেশে। আর প্রথম দর্শন উপলক্ষ থেকেই শিপ্রা প্রবীরের জীবনে একটা আকর্ষণ বিন্দু হয়ে যায়।

পরবর্তী সপ্তাহ দুই-এর মধ্যে তারা দু-তিনবার মুখোমুখী হয়ও। কিন্তু পরিচিতি সূচনা ঘটায় শিপ্রা। দক্ষিণ ভারতের এক বিখ্যাত শাস্ত্রীয় নর্তকীর নাচ উপলক্ষে শহরের সর্বাপেক্ষা নামকরা হলের অপেক্ষা-প্রাঙ্গণে উপচে পড়া ভিড়। অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে আধ ঘণ্টাখানেক বাকি। আগাম আগতদের সংখ্যাধিক্য ছিল নৃত্যশিল্পীটির লোকপ্রিয়তার অসাধারণত্ব-চিহ্ন। সবাই পূর্ব সমালোচনা-ব্যগ্র। যে-ই কোন পরিচিত লোক দেখতে পাচ্ছে সেই এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে অনুষ্ঠান-সাফল্য সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করছে। প্রবীরও তখন সেখানে। তার কাছে অনেকেই বেশ পরিচিত। সতীর্থদেরও বেশ কয়েকজন এদিকে ওদিকে জট পাকিয়ে আলাপ-আলোচনা করে যাচ্ছে। কিন্তু সে একা। সাংবাদিক জগতেও সেটা তার স্বাতন্ত্র্য। মনের মতো না হলে সে এগিয়ে গিয়ে তো কারো সঙ্গে কথাটথা বলেই না, ক্বাউকে এগিয়ে এসে তার সঙ্গে কথা বলার উৎসাহও দেয় না। ইতিমধ্যে শিপ্রাও সেখানে এসে যায়। প্রবীরের রক্ত চন করে ওঠে, ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যে তার প্রাণ আনচান করতে থাকে। কিন্তু তার গাম্ভীর্য-বন্দি নিশ্চাঞ্চল্য অটুট। হঠাৎ তার রক্তস্রোতে তুফান জাগিয়ে দিয়ে শিপ্রা এগিয়ে এসে বলে, শুনুন, কাল বিকেলে পাঁচটায় যদি অন্য কোন কাজ না থাকে তবে অজন্তায় একটু চা-টা খেতে আসবেন। নিমন্ত্রণ করছি। চমকে উঠলেন কেন? প্রবীর পুরকায়স্থকে অনেক অপরিচিত মানুষও তো নিমন্ত্রণ করে। আমিও করছি। তবে আমার নাম শিপ্রা। শিপ্রা সাতুস্কর। আমিও একজন···

শিপ্রাকে আর কিছু বলতে দেয় না প্রবীর। সে হেসে বলে, শিপ্রা সাতুস্করের সমাজ কলম পড়ে না মানুষ বোম্বেতে আছে নাকি?

শাস্ত্রীয় নাচ সম্পর্কে কিছু জানাটানা ছিল শিপ্রার এই আগ্রহ দেখানোর কারণ। কিন্তু সেটাই হয় তাদের বন্ধুত্বের সূচনা-বিন্দু। এবং তখন থেকেই তাদের বন্ধুত্ব ইতিহাসের প্রতি স্তরে প্রবীরের ব্যবহার বৈপ্যরীত্য-ধর্মী থেকেছে। সে এগিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে কিন্তু শিপ্রা তাকে ঠেলা দিয়ে এগিয়ে না নিলে বা না নেওয়া পর্যন্ত সে থেকেছে ঠায় দাঁড়িয়ে। প্রথমবার একত্রে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা ঠিক করেও সে যেমন করেছিল। একত্রে সিনেমা দেখতে

প্রথমবার যায় তারা শিপ্রার উদ্যোগ-তাড়নায়। স্ব-প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম ভণ্ডুল করে দেবার পর প্রবীর নিজে আর কোনদিন সিনেমা দেখতে যাবার কথা বলেনি। তেমনি স্মৃতি-নিকেতনের ফ্ল্যাট সম্বন্ধেও সে অনেক গুণগান গেয়েছে শিপ্রার কাছে, কিন্তু ওখানে ওকে কখনো নিয়ে যায়নি। শিপ্রা ওখানে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করা সত্ত্বেও। গোড়ায় যখন ওর তরফে আগ্রহ ছিল ঔৎসুক্যজনিত তখনো না, পরে যখন তাতে কান্দর্পিক ইঙ্গিত ফুটে ওঠে তখনো না। শেষ পর্যন্ত ওকে ওখানে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেও সে তা পণ্ড করে দেয়।

প্রবীরের এই ব্যবহার কাঠামোর কারণ অবশ্য ছিল নৈতিক সমস্যা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। রামতনু প্রদত্ত মাদুলীটা খোলার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার জীবন-লক্ষ্য ছিল বিদ্যানির্ভর সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠা। ঐ স্তরে তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ছিল উদ্যোগ-প্রীতি, অভিযান-ক্ষিপ্রতা এবং অধ্যয়ন-অনুরক্তি। কিন্তু ঐ মাদুলীটা খোলার পর তার মধ্যে ঘটে চিন্তা বিপ্লব। জীবন স্রোতের গতি লক্ষ্যও হয়ে যায় অনির্দিষ্ট। তার মা-বাবা তাকে ঠিক কি হতে চেয়েছিলেন সে বুঝতে পারে না। সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠার অর্থ গুলিয়ে যায়। তার জীবন-পিপাসাও ছিল অনেক। কিন্তু এখন তারও চরিত্র পালটে যায়। গুণ ও জ্ঞানের মোহ তার আবাল্য। এখনো তা শুধু থেকেই যায় না, বৃদ্ধি পায়। যা পালটে যায় তা মেয়ে-উৎসাহের প্রকৃতি। মেয়ে-সঙ্গ পেলেই সে আর নেচে ওঠে না, চরিতার্থ বোধ করে না। সে চায় এমন একজন সহচারিণী যার কাছে পাওয়া যাবে বুদ্ধি সাহচর্য। শিপ্রা তার এই বাসনা সিদ্ধি-সীমায় নিয়ে আসে। গোল-বাধে বন্ধুত্ব ঘনিয়ে উঠতে থাকলে। তখন থেকে সে বুঝতে পারে না তার আর শিপ্রার চাওয়া-পাওয়ার হিসেব-প্রকৃতি। তার অনবরত মনে হতে থাকে,— ওটা এক তো নয়ই, এতে পার্থক্য যা তাও মৌলিক।

প্রবীর হাঁটতে হাঁটতে কখন যে বেক্-বে এলাকা ছাড়িয়ে যায়, খেয়াল করে না। যখন তার অবস্থিতি সংবিত ফিরে আসে তখন সে কুলাবা পয়েন্টের কাছাকাছি। ওখানকার আগাছা-ছাওয়া বিস্তীর্ণতা এক জনহীন দ্বীপকণা। সূর্যাস্তের তখনো আধঘন্টার মতো বাকি। এপ্রিল মাস। রৌদ্রের ঝাঁঝ যথেষ্ট। সে আর এগোয় না। আর একটু এগোলে স্থল-জলের যে চিত্রপট চোখে পড়তো, তার প্রাকৃতিক মহিমা হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু সন্ধ্যা আসন্ন-প্রায়। অন্ধকারে ওখানে চলাফেরা কষ্টকর। ভয়ও ছিল। কিন্তু যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল তাথেকে একটু ডান দিকে অল্প দূরেই পাথর ছাওয়া সমুদ্র-সৈকত।

কাফ-পেরেডের শেষাংশ যার উত্তর প্রান্ত। সে ওখানে চলে যায়। কাফ-পেরেড সামান্য দূর হওয়ায় ওখানে বিকাল-প্রেমীরা দলে ভারী হয়। তবে এলাকাটার নিভৃতি মাধুর্য অটুট থাকে। হয় একটু বর্ণাঢ্য। বিচরণ-আমোদীরা সবাই জোড়া কিম্বা দলবদ্ধ যুবক-যুবতী হওয়ায়। ওটা হাঁটবার জায়গা নয়। সবাই পছন্দসই স্থান খুঁজে নিয়ে বসে গিয়েছিল, বসছিল। প্রবীরও নিজের পছন্দমত একটা পাথরে বসে যায়। শিপ্রা-ধ্যান অব্যাহত রেখে। অচিরেই সেটা বিশ্লেষণ-প্রবণ হয়ে উঠে। শিপ্রার প্রতি তার নিজের ব্যবহার বিশ্লেষণ করেছে সে আরো অনেকবার। কিন্তু প্রায় সব সময়-ই উপলক্ষ-সীমিত থেকে। এখন সে ওটা খুঁটে দেখতে থাকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে। হয় সে হয়রাণ। তার ব্যবহার-স্মৃতি যে ছক কাটে তা তার চোখে দেখায় নিখুঁত, নিষ্ঠা-নির্মল। ওর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে ততই তার মনে একটা সঙ্কল্প দৃঢ়তর হয়েছে,—ওকে তার আবেগ-জীবনের কেন্দ্র-বিন্দু করে তুলতে। ওর সঙ্গে তার মোড-ঘোরানো প্রত্যেকটা ব্যবহারের পেছনে বাসনা-প্রণোদনও এক।

গোড়ায় তাকে যা আকৃষ্ট করেছিল তা ছিল শিপ্রার সৌন্দর্য। ও ব্রাহ্মণ-তনয়া। পৈতৃক নাম কুমতাকর, শিপ্রা কুমতাকর। কুমতাকররা সারস্বত। সারস্বত ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্রে প্রচুর। কিন্তু কুমতাকরদের জন্মমুলুক কারোয়ার। জাত এবং মুলুক এক্ষেত্রে অর্থবহ। কারণ কারোয়ারী সারস্বত ব্রাহ্মণদের গৌড়-সারস্বত বলা হয়। এমনিতেই নয়, ইতিবৃত্ত অনুসারে বঙ্গের পুরোনো রাজধানী গৌড় এদের আদিবাসস্থান ছিল। সেটাও তাদের অতীত ইতিহাসের শেষ কথা নয়। শোনা যায় তারো আগে নাকি তারা ছিল কাশ্মীরবাসী। অর্থাৎ তারা কাশ্মীর থেকে গৌড়ে এবং গৌড় থেকে কারোয়ারে গিয়ে স্থায়ী হয়েছে। যাযাবর-প্রবণতা থেকে নয়, ইতিহাস উৎপীড়িত হয়ে। মুসলমান রাজত্বের প্রতি অনানুরক্তি হেতু তারা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে দু-দুবার।

কারোয়ারী সারস্বত ব্রাহ্মণরা খুব সুদর্শন। মেয়েরা তো অপ্সরা তুল্য। বিশেষ করে যৌবনে। শিপ্রা ছিল কারোয়ারী যুবতীদের মধ্যেও অনন্যা।

গোড়ায় শিপ্রার তরফে বন্ধুত্ব-ব্যগ্রতা ছিল সুবিধাবাদজাত আচরণ-কৌশল। প্রবীরের কাছে তার অনেক জানবার এবং শেখবার ছিল। কতকগুলো সুবিধাও পাওয়া যেতো। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি সাধারণতঃ হয় রাত্রে।

তার পক্ষে ওসবে যাওয়া আসার মতো উপস্থিতি ও সমস্যাসঙ্কুল ছিল। মর্যাদাবহ সাহচর্য-আশ্রয় ও সমস্ত সমস্যা থেকে তাকে বাঁচাতো। তাই ও কাউকে না কাউকে সঙ্গী করে নিতো। কিন্তু প্রবীরের ক্ষেত্রে সুবিধাবাদ হৃদ্যতার অঙ্কুর হয়ে যায়। সাংবাদিক মহলে গুজব জন্মায়। তার প্রতিধ্বনি তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায়। শিপ্রা অপ্রস্তুত হয় না, আমোদ পায়; প্রবীর হয়ে ওঠে প্রেমান্ধ। কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব-চরিত্রে জন্মে যায় অদ্ভুত জটিলতা। প্রথমবার সিনেমা যাবার প্রস্তাব উপলক্ষে তাদের কথোপকথন যার একটা নমুনা ভেসে উঠেছিল।

সে সমস্ত স্মৃতি জেগে উঠতে থাকায় প্রবীরের মন ব্যথা-ভারী হয়ে ওঠে। তার মনে হয় সে শিপ্রার সম্প্রীতি-ভাজন হবার মর্যাদা বোঝেনি। তাই তাদের বন্ধুত্ব আজ আসন্ন ভঙ্গুর। কিন্তু এ বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিঁড়ে যেতে সে দেবে না। শিপ্রাকে সে তার সব কথা বলবে। তার বৈপরীত্য-ধর্মী ব্যবহার কাঠামোর পেছনে যে করুণ কাহিনী লুকানো আছে, সেটা জানতে পারার পর ওর মধ্যেও তার জন্য সত্য ভালবাসা জাগবে। ও বিদুষী, বুদ্ধিমতী, সংগ্রাম-সংগঠিতা। তার জীবনীর বিয়োগান্ত দিকটার কারুণ্য ও •া বুঝলে কে বুঝতে পারবে? কাল-ই ওকে সে সব কথা বলবে।

কাফ-পেরেড থেকে সে যখন বাড়ি ফেরার পথে রওনা হয় রাত তখন আটটা। ওখান থেকে সামান্য দূরেই একটা বড় বাস-টার্মিনাস। ওখান থেকে বাস ধরে সে খার পর্যন্ত যেতে পারতো; কিন্তু সেখানে সে বাস ধরতে যায় না। ও রুটটা যায় শহরের বুক চিরে, সমুদ্রের ধার দিয়ে নয়। শিপ্রাকে তার জীবন কাহিনী শোনানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যাওয়ার পর তার মন এক নতুন আশা-সুখে ভরপুর। ওটা সে উপলব্ধি-বন্দি রাখতে চায়। সেজন্যে তার চাই সমুদ্রের তীর ঘেঁষে যায় ডাবল-ডেকার। ওতে ওপরতলার জানালা ঘেঁষা সিটে সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে সে এই আশা-সুখে হাবুডুবু খেতে খেতে বাড়ি যাবে।

ও-বাস ছাড়ে ফ্লোরা ফাউন্টেন থেকে। সেটা প্রায় মাইল দেড়েক দূরে। তাতে কি? সমুদ্রের কিনার দিয়ে হাওয়া-স্নাত হয়ে হয়ে হেঁটে যেতে কতো ভাল লাগবে। মনের সুখে সে হাঁটতেই থাকে। গৃহ-ব্যাকুল দ্রুতি তাড়নায় নয়, আনন্দ-সিক্ত মন্থরতায়।

ফ্লোরা ফাউন্টেনের বাস-টার্মিনাসে সে যখন এসে পৌঁছায় তখন রাত প্রায় ন-টা। শহরতলী-মুখো কোন বাস রুটেই ভিড় কমেনি। সে যে রুটটা দিয়ে

যেতে চায়, তাতেই ভিড় সর্বাপেক্ষা বেশী। গরমের দিনে ও-রুটে বাসভ্রমণ অনেকেরই ভাল লাগে। তাছাড়া রুটটা বৃহত্তর বোম্বের শেষ সীমা পর্যন্ত যায়। লাইনে একটু বেশী সময় দাঁড়ালে প্রথম চার পাঁচজন যাত্রীদের একজন হয়ে ইচ্ছামত সিট বেছে নেওয়া যায়। লম্ফ-ঝম্ফ করায় আপত্তি না থাকলে দশ-পনের জনের একজন হলেও চলে। প্রবীর তা করতে চায় না। সুখ-নিমজ্জিত মন চায় দ্রুতি না, স্থিতি।

কিন্তু চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম যাত্রী হবার জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় বাসটা যাত্রী-ভর্তি হতে দেখতে যেয়ে প্রবীর চমকে ওঠে। ওতে প্রথম যে কয়জন যাত্রী লাফিয়ে ওঠে তাদের একজন শিপ্রা! একা, কিন্তু স্মৃতি-তৃপ্তিতে ভরপুর।

॥ চার

প্রবীরের প্রথমত মনে হয় সে ভুল করেছে। না, তার ভুল হয়নি। সমুদ্র পড়বে এবার বাঁদিকে। সেই দিকেরই জানালাঘেঁষা একটা সিটে যে এসে বসে, সে শিপ্রা-ই। যাত্রীদের লাইনও ওদিকেই। ফ্লোরা ফাউণ্টেন শহরের হৃৎপিণ্ড। কিন্তু পেভমেণ্টের দু কিনারেই কয়েকটা বড় গাছ ছিল। আশপাশ একটু আবছা। প্রবীরকে বাস থেকে দেখতে পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু এদিকে পা পা করে তাকে এগোতে হচ্ছিল। আর একটু এগোলেই সে শিপ্রার দৃষ্টি সীমায় পড়ে যাবে। আলোতে, বাস থেকে ফুট-দেড়েক দূরে। সে শিপ্রার দৃষ্টিগোচর হতে চায় না। মনে হয়, এ পরিস্থিতিতে চোখাচোখি হওয়ার ধাক্কাটা তার সইবে না। উচিতও হবে না। তাদের বন্ধুত্বের শেষ পরিণতি এসে যেতে পারে। তা ভালই হোক বা মন্দ। সে লাইন থেকে সরে যায়।

পরদিন বিকেলে অজন্তাতে বসে চা খেতে খেতে শিপ্রাকে প্রবীর শুধয়, কাল বিকেলে সকাল সকাল বাড়ি ফিরে গিয়ে কি করলে?

কালকের কথা তোল না। বাড়িতেও ভাল লাগছিল না। ভাগ্যিস লাইব্রেরী থেকে একটা ইংরেজী উপন্যাস নিয়ে রাখা ছিল। ওটা পড়ে পড়ে সময় কাটালাম। হ্যাঁ, উপন্যাসটা তুমিও পড়ো। অ্যান রাইণ্ডের লেখা বই।

নাম "ফাউন্টেন হেড"।

শিপ্রার জবাব শুনতে শুনতে প্রবীরের মনে হয় তার হৃৎপিণ্ডে ছোরার ঘা পড়ছে। ব্যথা ভরা জীবন তার। কত রকম ব্যথাই না সে পেয়েছে আজ পর্যন্ত। কিন্তু যে ব্যথা শিপ্রার জবাব থেকে সে পাচ্ছে তার তুলনা নাই। তীব্রতায়। মিথ্যা যে এমন একটা নিদারুণ স্বীকারোক্তি হতে পারে, সে কোনদিন কল্পনা করেনি।

তিন চার ঘণ্টা আগে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে ভাবা শিপ্রাকে ফ্লোরা ফাউন্টেনের এক বাসে উঠতে দেখা অবধি প্রবীরের মনে ছিল একটা মাত্র আশা-রশ্মি। সে যে বাড়ি না গিয়ে শহরেই অনেকক্ষণ থেকে গিয়ে ছিল, শিপ্রা নিজেই তাকে সে কথা বলবে। পরবর্তী প্রথম সাক্ষাতের গোড়াতেই। কিন্তু অজন্তায় বসে চা খাওয়ার অভ্যেস-নির্ধারিত সময় সীমার আধাআধি হয়ে যাওয়া পর্যন্ত শিপ্রা ও সম্বন্ধে কিছু বলেনি। আর এখন এই মিথ্যা-আশ্রিত স্বীকারোক্তি। প্রবীরের মন ছেয়ে আবার জাগে জমাট শূন্যতা এবং বিচ্ছিন্নতা-বোধ। কথা বলতে আর ইচ্ছে হয় না। না, কথা বলার শক্তি যেন তার পঙ্গু হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কথা না বলে থাকা অসম্ভব। শিপ্রার বাক্-উৎসাহ প্রবল হয়ে উঠছিল। তার বক্তব্য-বিষয় অফিসে ঘটা কি একটা ব্যাপার। কিন্তু ওটা ব্যাখ্যা করতে যেয়ে সে সাংবাদিক জগতের কৌতূহল উদ্দীপক অসম্পূর্ণতাগুলো সম্পর্কে ব্যঙ্গ-নিপুণ হয়ে ওঠেছিল। তাতে প্রবীরকে সামিল হতে পারছে না দেখতে পেলে ও প্রশ্ন-তৎপর হবে। কেন সে কথা বলছে না, কেন তাকে মনমরা দেখাচ্ছে, জিগ্যেস করবে। না, তা সে হতে দেবে না।

একবার তার ইচ্ছে হয় বলে, "আচ্ছা শিপ্রা, কাল বিকেল সম্পর্কে মিথ্যা কথার কি প্রয়োজন ছিল? আমাকে তুমি নিজের মন বুঝতে পারে না মানুষদের একজন মনে কর, কিন্তু তুমি নিজেও তো তাই।" কথাটা মিথ্যা হতো না। তাদের বন্ধুত্ব পাকা হয়ে ওঠার পর শিপ্রা অনেকবার কথা দিয়ে কথা রাখেনি। অনেকবার তাকে বৃথা অপেক্ষায় আটকে রেখেছে। রাত্রে ডাকা অনুষ্ঠানাদিতে প্রবীরের সঙ্গে যাওয়া তার একটা দস্তুরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দু-একবার ব্যতিক্রম ঘটেছে। শিপ্রা অন্য কারো সাথে চলে গেছে, প্রবীরকে কিচ্ছু না জানিয়ে। এ সমস্ত উপলক্ষে শিপ্রার ব্যাখ্যা প্রায় সব সময়ই অসত্য হতো। প্রথম প্রথম প্রবীর তা দেখতে পেতো না। কিন্তু আস্তে আস্তে পরিস্থিতিটা সে বুঝে যায়॥ দু-একবার শিপ্রার মিথ্যা-ব্যাখ্যা ধরে ফেলে এবং

সপ্রমাণে দেখিয়েও দেয়। শিপ্রার সঙ্গে তার প্রণয়-প্রয়াস এঁকেবেঁকে দ্বিধা ব্যাহত হতো সে কারণেও। কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব ছিল তখন অন্য খাতে। ওসব ছলনায় বন্ধুত্ব-বন্ধন আঁটুনি-মধুর হতো।

প্রবীরের জীবনে একাকীত্ব বোধ আবার ফিরে আসে। শিপ্রার সঙ্গে দৈনিক মোলাকাতও আর হয় না। আস্তে আস্তে ওকে সে অন্যের সঙ্গেই সাহচর্য-বন্দি দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

কিন্তু সে হতাশা-বিলাসী হয়ে ওঠে না। কারণ এই শিপ্রা-বিভ্রাট ঘটেছিল তার জীবনস্রোতের গতিমুখ পাল্টে যাওয়ায়। শশাঙ্ক আকাঙ্ক্ষিত মানুষ হওয়া যে কি, সে এখনো জানে না। কিন্তু তার সামনে এমন একটা জীবন-লক্ষ্য ভেসে ওঠে যা তাকে উদ্দীপনা-ক্ষিপ্ত করে তোলে। উপন্যাস লেখা। জাতীয় জাগরণের ইতিহাসকে বিষয়বস্তু করে একটা উপন্যাস লেখা আরম্ভও করে দেয়। মা-বাবাকে মুখ্য চরিত্র ক'রে। বিকেলগুলো ফাঁকা যেতে আরম্ভ করেছিল। ও সময় স্মৃতি-নিকেতনও ফাঁকা থাকতো। ঐ সময়টাই সে তার উপন্যাস লেখার জন্যে সংরক্ষিত করে নেয়। লেখা এগোতে থাকে নির্বাধায়।

কিন্তু একদিন নতুন অভ্যেস মতো অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দেখে বাড়িতে তার অপেক্ষায় আছে প্রভা। তোমার অপেক্ষায় চা-জলখাবার নিয়ে বসে আছি কিন্তু, প্রবীর। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছেড়ে এসো, সে বলে,—তার মুখে সম্প্রীতির হাসি, স্বরে সেথো আন্তরিকতা।

আরে ঃ! আমার অপেক্ষায় চা-জলখাবাব নিয়ে বসে থাকার কি প্রয়োজন ছিল? কি অন্যায় বলো তো? প্রবীর ব্যস্তসমস্ত হয়ে পোষাক বদলাতে চলে যায়।

কিন্তু মনে মনে সে অবাক। বেসরকারী ভাবে প্রভাও স্মৃতি-নিকেতন অধিবাসী হয়ে গিয়েছিল। এতোদিন ধরে তারা একত্রে থাকছে। সাধারণ ভদ্রতার প্রয়োজনে যে দু-চার কথা না বললেই নয় তার বেশী একটা কথারও আদান-প্রদান হয়নি কোনদিন তাদের মধ্যে। হেতু প্রভারই মনোভাব। ও একটা হিম-শীতল পাশ কেটে থাকা ভাব দেখিয়ে তাকে দূরে ঠেকিয়ে রেখেছে। হঠাৎ আজ ওর তরফে সাথীপনা কেন?

তাড়াতাড়িতেই কাপড় ছেড়ে প্রবীর যখন বসার ঘরে ফিরে আসে, তখন প্রভা জলখাবার সাজিয়ে রাখছিল। খাদ্য-তালিকা লম্বা। সবই ঘরে তৈরী। পরিকল্পিত আপ্যায়ন লক্ষণ। কিন্তু কেন?

হাসির মুখোশ-পরা প্রবীর খেতে বসতে যেয়ে জিগ্যেস করে, চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় সবই আছে দেখছি। ব্যাপার কি?

প্রভা সে প্রশ্নের জবাব দেয় না। রেকাবীতে একটা বিশেষ খাবারের কিছুটা প্রবীরের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজের চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বলে, চেখে দেখতো এটা মুখে দেওয়া যায় কিনা?

গুজরাটি খাদ্য তালিকায় যার স্থান বেশ উঁচুতে তাথেকেই খানিকটা প্রবীরকে খেতে দেওয়া হয়েছিল। জিনিষটা তেমন কিছুই নয়। ক্ষীরের পুর বসানো বেসনের পা-রুটা। নাম "পূরণপুলি"। পরিবেশনের সময় ওতে জবজবা ঘি ঢালা হয়। খেতে বেশ ভালই লাগে। নিরু দেশে থাকতে স্মৃতি-নিকেতনেই সে ওটা কয়েকবার খেয়েছিল। কানুর বাবার বাড়িতেও সে খেয়েছে অনেকবার। কিন্তু ওথেকে এক টুকরো মুখে দিয়েই প্রবীর বুঝতে পারে, রন্ধন-শৈলীর দৌলতে খাবারটা অত্যন্ত উপাদেয় হয়েছে। সেটা সে সোচ্চারে ঘোষণাও করে।

অম্বা প্রয়োজনে সাহায্যের জন্যে কাছেই দাঁড়ানো। সে বলে, ওটা প্রভাবেন নিজে রেঁধেছে।

বুঝতে পেরেছি।

না বল, সত্যি ওটা মুখে দেওয়া যায়? প্রভা বলে, তার মুখে সারল্য-স্নিগ্ধ শ্লাঘা-ছায়া।

বললাম তো, অপূর্ব হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ আজ তোমার এই রন্ধন-উৎসাহ কেন?

প্রভার মুখ খুশীতে ডগমগ করে ওঠে। প্রবীরকে অন্য একটা খাবার দিয়ে সে বলে, আজ সুরেশের জন্মদিন। তাই বাড়িতে বসে এটা-সেটা করা গেল। করেছে সব অম্বাই। আমি তৈরী ঝোলে নুন দিয়ে বাহবা কুড়ুচ্ছি। হাসতে হাসতে প্রভাও নিজের জন্যে একটা প্লেটে করে কিছু খাবার তুলে নেয়।

প্রেমিকের জন্মদিনে প্রেমিকা তার নিজের হাতে রাঁধা খাবার বাড়ির সহ-অধিবাসীদের যে একজনকে হাতের কাছে পাওয়া গেল তাকে দিয়েই যদি চাখিয়ে নেয়, তো তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? কিন্তু সেদিন থেকে প্রবীর লক্ষ্য করে প্রভা তার দিকে বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। তখন এটাও বোঝা যায়, তাদের দুজনের মধ্যে মৌনতা-শীতল দূরত্বের অন্ততঃ একটা কারণ বাক্-মাধ্যম। বোম্বের আঞ্চলিকতা মুক্ত সমাজের শিক্ষিতাংশে ওটা ইংরেজী। উচ্চমানের।

স্বভাষীদের মধ্যেও ওটা চলতো বেশী। প্রভার ইংরেজী ছিল মফঃস্বলী। তবে এখন বেশ কয়েক মাস বোম্বেতে পাঠরত থাকার ফলে ইংরেজীও ভাল বলতে আরম্ভ করেছে ও।

আরো একটা জিনিস প্রবীর লক্ষ্য করে। প্রভা বাক-সংযত, কিন্তু সাহচর্য-প্রেমী এবং আমোদ-প্রিয়।

তবু হঠাৎ এক বিকেলে প্রভাকে তার অফিসে এসে হাজির হতে দেখে প্রবীর বিস্মিত না হয়ে পারে না। আচমকা ওখানে ওর এসে পড়াটাই যথেষ্ট বিস্ময়জনক ছিল। যে বেশে ও এসেছিল, সেটা ছিল তার চেয়েও বেশী। বেশভূষায় প্রভা সবসময়ই পরিপাটি। কিন্তু ওর পরিপাট্যে বিলাস-বাহুল্যের স্থান ছিল না। একে ও খদ্দরধারিণী ছিল। বিনা ব্যতিক্রমে। প্রসাধনের পরিমিতি-নির্ভরতাও ছিল কঠোর। মুখে একটু ক্রীম-পাউডার ছাড়া আর কিছুই ছোঁয়াতো না। কিন্তু সেদিন ও এসেছিল অপরূপ সেজেগুজে। চোখে কাজল, কপালে টিপ, ঠোঁটে লিপষ্টিকের একটু ছোঁয়া! হ্যাঁ গায়ে কিছু গহনাও। বস্ত্র-সম্ভারও খাদি-সর্বস্ব না হয়ে রেশম-সংমিশ্রিত। মারাঠি-গুজরাটি সব মেয়েদের মতো প্রভাও বেণীতে ফুল গুঁজে নিতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু সেদিন চুল বাঁধা হয়েছিল খোঁপা করে এবং তাতে ছিল একটি "গাজরা"। রজনীগন্ধার।

প্রভার ব্যবহারেও একটা মানানসই চটপটপনা ছিল সেদিন। প্রবীরের কিউবিক্‌লে ঢোকেই সে একটু ফরফর করেই বলে,—ইংরেজীতে—তোমার কাজ শেষ হতে কতো দেরী? কয়েক মিনিট, না? তাহলে সময়টা বেছে নিয়েছি ঠিক। আচ্ছা, তাড়াতাড়ি যা করার বাকি আছে করে নাও; আমি বসছি।—বসা নিয়মবিরুদ্ধ হবে না, তো? না! আমি তাহলে বসছি। কিন্তু তাড়াতাড়ি কর! তোমাকে সঙ্গে নিয়ে একটু ঘুরে বেড়ানোর মতলবে এসেছি। ভুল করিনি তো?

সুরেশের জন্মদিন থেকেই প্রবীরের প্রতি প্রভার ব্যবহারে সাথীসুলভ হৃদ্যতা এসে যাচ্ছিল। সেদিন ওটা আরো স্পষ্ট হয়, আরো সম্প্রীতিমধুর ঠেকে। বস্তুতঃ ওর সেজেগুজে অফিসে হানা দিয়ে তাকে টেনে বার করে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার উদ্দেশ্যে এসে যে অধিকার আশ্রিত সাথীপনা দেখিয়েছিল, তাতে প্রবীরের মন অজানা আবেগের সাড়া অনুভব করে। কিন্তু প্রবীরের বিস্ময় সীমাহীন হয় যখন সে প্রভার সঙ্গে রাস্তায় নেমে আসে। মেসোদের বড় বড় গাড়িতে ওকে যেতে আসতে প্রায়ই দেখা যেত। সেদিন সেখানে তাদের

অপেক্ষায় যে নতুন কেনা মারসিডিজ্-বেন্জটি দাঁড়ানো দেখা যায় তা যান-যান্ত্রিক নব্যতার শেষ নিদর্শন মনে হয়। মেসোমশায় ওটা নতুন কিনেছে। তাই ওটাতে চড়ে ঘুরে বেড়াতে বেরিয়েছি। কেমন মনে হচ্ছে গাড়িটা? চমৎকার, না? প্রভা বলে।

সেদিন তারা গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া, বেলার্ড-পীয়ার, চৌপাটি, হ্যাঙ্গিং গার্ডেন বানগঙ্গা, ওয়ারলী সী-ফেস ইত্যাদি হয়ে চলে যায় জুহু বালুচরে। তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছিল। সৈকত-আমোদীদের ভিড় কমের দিকে। তবু তারা যেয়ে বসে বালিয়াড়ীর তাল-নারকেল গাছে ছাওয়া পৃষ্ঠ-রেখাটা ঘেঁষে। নিরালা হতে। কারণ প্রবীরের অনেকক্ষণ ধরে মনে হচ্ছিল তাকে যেন প্রভা বিশেষ একটা কিছু বলতে চায়। ওখানে বসতে বসতেই সন্দেহটা ঠিক প্রমাণিত হয়। কিন্তু কথায় নয়, মৌনতায়। প্রবীরের অফিস থেকে বেরনোর পর প্রভা সেদিন কথা বলে যাচ্ছিল নির্বিরাম। ওর খুচরো কথার ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল। বলতেও পারতো ওসব মনোরঞ্জক বাকনৈপুণ্য ফুটিয়ে। কিন্তু বালিয়াড়ীতে বসেই ও হয়ে যায় চুপ। একদম। অর্থবহ মৌনতা। অচিরেই প্রবীরের মনে হয় প্রভা যেন কাঁদছে। নীরবে। এক অভিনব আবেগউচ্ছ্বাসে প্রবীব জিগ্যেস করে, কাঁদছ কেন প্রভা?

বা-রে কাঁদব কেন?

তা কি করে জানব? তুমি না বললে?

কিন্তু কে বলল তোমাকে আমি কাঁদছি?

ঝোঁকের মাথায় প্রবীর এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসে। সে হাত বাড়িয়ে প্রভার চোখ গাল হাতড়ে দেখে। তার অনুমান সত্য। প্রভার চোখে জল, গাল অশ্রুসিক্ত। আবেগ অন্ধ হয়ে সে প্রভাকে টেনে ধরে। প্রভা বাধা দেয় না। প্রবীরের কাঁধে মুখ লুকিয়ে খোলাখুলি কাঁদতে আরম্ভ করে, তার বাঁধ ভাঙ্গা অশ্রুধারায় প্রবীরের জামা ভিজে জবজবা হতে থাকে। প্রবীরের বুক আবেগ ঝড় আরো উত্তাল হয়ে ওঠে। সে জিগ্যেস করে, কেন এতো কাঁদছ, প্রভা? দরদভরা মনে সে প্রভাকে আরো নিবিড়ভাবে টেনে ধরে।

প্রভা চুপচাপ শুধু কেঁদেই যায়। শাড়ীর এক আঁচলাংশ মুখে চেপে ধরে রেখে। কিন্তু কান্না তার যখন অবশেষে থামে তখন সে শুধু একটু সরে বসে বলে, চল এবার বাড়ি ফিরে যাই। রাত অনেক হয়ে গেছে।

চল।

কিন্তু গাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেই প্রভা বলে, আমি খুব দুঃখিত, প্রবীর। তোমার একটা বিকেল মাটী করলাম।

কি যে বল তুমি, প্রভা। প্রবীর ওর একটা হাত নিজের মুঠোয় নেয়। প্রভা তার হাত টেনে নেয় না। দুহাতের আঙ্গুল গ্রন্থি--বদ্ধ হয়।

প্রভা অনুতাপ-কোমল স্বরে বলে, নয়তো কি? আমোদ-ভ্রমণের নামে তোমাকে টেনে এনে কাঁদুনে নাটক দেখিয়ে দিলাম। অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরে গেলে তোমার লেখার কাজ কত এগিয়ে যেত।

ইতিমধ্যে তারা গাড়ির কাছে এসে যায়। তাতে উঠে প্রবীর জবাব দেয়, দেখ প্রভা, তোমাকে একটা কথা বলতে যাচ্ছি। কিছু মনে করো না। আজ ক'দিন ধরেই আমার মনে হচ্ছিল কি একটা বুক-ভাঙ্গানো ব্যথায় তুমি গুমরে মরছো। জিগ্যেস করতে পারি, কেন? প্রভা হাসে। বাগে পেয়ে মনের কথা হাতড়ে বার করতে চাচ্ছ, না? শোন মেয়েদের কান্নার কারণ সব সময় ব্যথা নয়। মুক্তিপ্রাপ্তা আধুনিকাদের কথা জানি না। কিন্তু যারা আমার মতো ঘরোয়া গোছের মেয়ে তাদের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন তারা কেঁদে সুখ পায়। তাদের ক্ষেত্রে ওটা বিশেষ বয়েস-বৈচিত্র্য। কিন্তু তুমি তো মেয়ে নও। তোমাকে কেন প্রায়ই কাঁদো কাঁদো অবস্থায় দেখি?

আমাকে! প্রবীর যেন আকাশ থেকে পড়ে। আমাকে কত লোকে কত কথা-ই না বলেছে। কিন্তু আমি সব সময় কাঁদো কাঁদো অবস্থায় থাকি একথা আর কেউ বলেনি।

সবাই কি সব কিছু দেখতে পায়? স্মৃতি-নিকেতনে আমরা চারজনে থাকি। দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্না অম্বাও আছে। অথচ একমাত্র তুমিই আমাকে বুক ভাঙ্গা ব্যথা বয়ে বেড়াতে দেখেছ। হয় তোমার দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছে নয় ওরা তিনজন স্থূলদর্শী। কি বল?

বেকায়দায় ফেলেছ আমায়, না? কিন্তু সে আর কিছু বলে না।

প্রভা হাসে। বলে, যা বললে তা আমার কথার জবাব হলো?

কিন্তু ইতিমধ্যে গাড়ি স্মৃতি-নিকেতনের গেটে এসে থেমে যায়।

রাত তখন দশটা নাগাদ, বাড়িতে কানু এবং সুরেশ দুজনেই উপস্থিত। দুজনেই একটু উৎকণ্ঠা-উৎপীড়িত। প্রবীর জিগ্যেস করে, তোরা কখন ফিরলি?

জবাব দেয় কানু। অনেকক্ষণ। তোদের ফিরতে এতো দেরী কেন? সিনেমা-টিনেমা দেখে এলি নাকি?

না, একটু আমোদ-ভ্রমণ করে এলাম। প্রভার কৃপায়। তার মেসোর নতুন কেনা মারসিডিজ-বেন্‌জ গাড়িটাতে বসে। বেশ লাগলো।

প্রবীর ইচ্ছে করেই একটু বাক্‌-বাহুল্যে আশ্রয় নেয়। তার মনে হচ্ছিল বাড়ির আবহাওয়া অসহিষ্ণুতা উত্তপ্ত। অনির্ণিত মানসিক সংঘাতে। যে-কোন মুহূর্তে কর্কশ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

যা সত্যি ঘটে তা কর্কশ নয়, প্রহেলিকা-আবছা। বাড়িতে এসেই প্রভা নীরবে কারো দিকে না চেয়ে নিজের ঘরে যেয়ে ঢোকে আর বেরয় না। ডাকাডাকি, সাধাসাধি সব ব্যর্থ হয়। শেষে সুরেশ, কানু এবং প্রবীরকে প্রভার হুড়কো-আটকানো দরজার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে একা দাঁড়িয়ে থাকে। নির্বাক হয়ে নয়। সে কি বলে বাড়ির অন্য কেউ শুনতে পায় না। কিন্তু আরো অল্পক্ষণের মধ্যে সে প্রভাকে নিয়ে খাবার ঘরে এসে যায়। সে রাত্রেও খাবার টেবিলে অন্যান্য দিনের মতো খোশ-গল্প এবং হাসাহাসি হয়, প্রভাও তাথেকে সরে থাকে না। কিন্তু তার মুখ দেখে সবাই বুঝতে পারে অর্গলবদ্ধ ঘরে সে যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণই সে কাঁদছিল। মুখ ধোয়ায় এবং মুখে যথেষ্ট পাউডার দেওয়ায় সেই রোদন-চিহ্ন ঢাকা পড়ে না।

পরদিন ভোরেই প্রভা আর সুরেশ কার্লা কেভ দেখতে চলে যায়। কানুকে প্রবীর বলে, ওরা দুজনের ব্যাপারটা আমি কিন্তু একদম বুঝতে পারছি না। সব কথা বুঝিয়ে বল না একদিন।

না বুঝবার মতো কি আছে এতে? প্রেমের নৌকায় সফর করতে গেলে ঝড়-তুফানে মাঝে-মধ্যে পড়তেই হয়। তুইও তো নেহাৎ অনভিজ্ঞ নয়। তোর এ তথ্য না জানা থাকার তো কথা নয়।

আমার কথা ছাড়। কবে হচ্ছে ওদের বিয়ে?

জানি না।

কাল ওদের মধ্যে কি হয়েছিল তাও না?

তা জানি। প্রভা তার মেসোর নতুন মার্সিডিজ-বেন্‌জটা একদিনের জন্য চেয়ে নিয়েছিল একটু সামাজিকতা করতে। বোম্বেতে ওর অনেক বড়লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে। সুরেশেরও শহরের উচ্চসমাজে একটা স্থান আছে। তাই ওর ইচ্ছে ছিল সুরেশকে নিয়ে ঐ সমস্ত বড়লোকদের বাড়িতে দেখা সাক্ষাতের জন্যে যাবে। সুরেশও রাজি হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে প্রোগ্রামটা বাতিল করে দেয়। কাজ-টাজের অছিলায় নয়। যা করতে চাওয়া

হয়েছিল তাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা শেষ পর্যন্ত তার কাছে সমীচীন নয় মনে হওয়ায়।

সমীচীন নয় মনে করলো কেন ও?

আবার একটা গুজব-ঝঞ্ঝা সৃষ্টি হতে পারার ভয়ে।

কিন্তু প্রভা কাল অনেক কেঁদেছে। কেঁদেছিল জুহুতেও। ওখানেই ওর কান্না শুরু হয়েছিল।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা করুণ-ই। কিন্তু কি করা যাবে?

প্রভা কেন হঠাৎ এমন সমাজ-উৎসাহী হয়ে উঠেছিল সেটাও কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কানু হাসে। এটাও বুঝতে পারছিস না, হাবারাম? সুরেশের কাছে ও বাক্-বন্দি সেটা জাহির করবার জন্যে। বোম্বে তো আর আমেদাবাদ নয়? এখানে এনগেজমেন্টের সামাজিক কদর আছে। অরক্ষণীয়ার ক্ষেত্রে এটা একটা মর্যাদাবহ রক্ষাকবচ ও। তাছাড়া বিয়ে যখন শিগগির হবার সম্ভাবনা এখনো দেখা যাচ্ছে না, তখন বিজ্ঞপ্তি-বন্দি এনগেজমেন্টের মূল্যও অনেক। প্রেমের ব্যাপারে মেয়েদের অনেক দিকেই নজর রাখতে হয়, বুঝলি কিছু?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

প্রভা এবং প্রবীর এখন সংলাপ-বন্দি সাথীপনায় একত্রে ঘুরে বেড়াতে কিম্বা নিরালায় বসে সময় কাটাতে সদা-ব্যগ্র। অফুরন্ত তাদের সংলাপ-সামগ্রী। নিভৃতে একত্র হতেই তাদের বাক্-ভাণ্ডার খুলে যায়। চলে অবিরাম।

একদিন প্রবীর প্রভাকে বলে, তুমি কি সত্যিই রাজনীতি করা ছেড়ে দিয়েছ?

কবে!

কিন্তু কেন?

কারণটা তুমি শোননি?

শুনেছি, বিশ্বাস করিনি।

কেন?

সুরেশ এখনো রাজনীতি করছে যে।

সুরেশের পড়াশোনা অসমাপ্ত নয়।

এটা যুক্তিতর্কের বিষয় নয়, প্রভা। আমাকে আসল কথাটা বলতে না চাও বলো না। যুক্তি দেখিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে যেয়ো না।

কথাবার্তা হচ্ছিল তাদের বান্দ্রা বাস-স্ট্যাণ্ডের ওপাশে। প্রস্তর-বহুল সমুদ্র-

সৈকতের বিস্তীর্ণতা যেখানে জলরেখায় সীমাবন্দী, তার কাছে নির্জনতা রক্ষিত হয়ে। সূর্য অস্তিম-প্রায় ভাটায় পড়া আরব সাগর এক সমীরণ শীতল প্রশান্তি পট। একটা উঁচু এবং প্রশস্ত প্রস্তর খণ্ডে হেলান দিয়ে আরেকটা প্রস্তর খণ্ডে পাশাপাশি বসে তারা আলাপ-আলোচনারত। প্রবীরের মন্তব্য শুনে প্রভা সমুদ্রপটের দিকে একটু বেশী আকৃষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তার ভুরুরেখা কুঁচকানো। তোমার এ প্রশ্নের ইঙ্গিত কি, আমি জানি। একরাত্রে জুহুতেও তোমার এক মন্তব্যে ঠিক এই ইঙ্গিতটা ছিল। অন্য কেউ এ ইঙ্গিত দিলে তাকে এমন জবাব দিতাম যে সে আর আমার সামনে আসতেই সাহস পেত না। কিন্তু তোমাকে সে রকম জবাব দিতে পারি না। হৃদয়ের জগতে তুমি আর আমি স্বগোষ্ঠী। বুক ভাঙ্গা ব্যথা বয়ে বেড়ানোর জন্যেই আমরা জন্মেছি।

না, ওকথা বলো না। ওতে ব্যথা-বিলাসীর গন্ধ পাই। ভাল লাগে না।

দুঃখকে একটা বিলাসিতায় পরিণত করতে পারার সার্থকতা আছে। দুঃখ যেখানে প্রতিকার অতীত সেখানে দুটো পথ খোলা থাকে। দুঃখটাকে ভুলে যাওয়া কিম্বা বিলাসিতায় পরিণত করা। তৃতীয় পথও একটা আছে। দুঃখের সঙ্গে লড়ে চলা। কিন্তু এ পথটা সব ক্ষেত্রে খোলা থাকে না। আমার ক্ষেত্রে নাই।

তোমার দুঃখটা কি, আমাকে কিন্তু বলনি এখনো।

তুমি কি তোমার দুঃখটা আমাকে বলেছ ?

প্রবীর চুপ।

চুপ করে আছ যে? গোঁ ধরেছ ? কিন্তু যে কথাটা তুমি আমার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছ, তার চেয়ে বড় জীবন-সমস্যা আমার আর নাই। এটা আমি কাউকে বলি না, বলতে চাইলে নিজের কাছেই নিজের মাথা হেঁট হয়। একমাত্র তুমিই একজন মানুষ যার কাছে ওটা বলতে কোন বাধা আছে বলে মনে হয় না। তবে আমার মুশকিল এই যে, বলে ফেলার মতো যথেষ্ট প্রেরণা পাচ্ছি না। ভাবি, কি হবে বলে ? তোমার দুঃখটা আগে বল না ? সমব্যথা যদি প্রেরণা দেয়।

কিন্তু আমার ব্যথাটা কি সেটা জেনেও যদি প্রেরণা না পাও ?

আমার দুঃখটা কি তা বলব না।

সেটা আমাকে ফাঁকি দেবার সামিল হবে না ?

কেন ? সেদিন জুহুতে তুমি কেন আমার কাহিনীটি জানতে চেয়েছিলে ? নিজেকে আমার দরদী মনে করে, নয় কি ? তোমার ওপর আমার এবং আমার

ওপর তোমার যে অধিকার জন্মেছে সেটা দরদের অধিকার। দরদ আর ফাঁকিতে সহবাস অসম্ভব। দুটোতেই কিংবা দুটোর একটাতে ভেজাল না থাকলে। তুমি যদি তোমার দুঃখের কাহিনীটা না বল তাতে তোমার প্রতি আমার দরদ মরে যাবে না। তোমার দুঃখটা কি সেটা অজানা থাকবে। কিন্তু তুমি যে দুঃখী, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত থাকব। তুমিও আমার দরদী হয়ে গেছ আমাকে দুঃখী ভেবে, আমার দুঃখটা কি সেটা জেনে নয়।

প্রবীর অত্যন্ত গম্ভীর। সূর্য ডুবে গিয়েছিল। ঢেউ-এ দোদুল সমুদ্র বক্ষ রক্তরাঙ্গা তার দৃষ্টি সেদিকে। সে বলে, যে কথাটা তুমি আমার কাছে জানতে চাচ্ছ সেটা আমিও আজ পর্যন্ত কাউকেই বলিনি। আজ বলব। তোমাকে। তোমার কঠোর জীবন সত্যটা জানতে চাই বলে নয়। তোমাকে কাহিনীটা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। তুমি কল্পনা করতে পারবে না আমি কত একা, আমার এই একাকীত্ব কত মরু-ধূসর, কত নিঃসীম। জান, সে রাত জুহুতে যখন তুমি আমাকে বলেছিলে আমাকে প্রায়ই তুমি কাঁদো কাঁদো অবস্থায় দেখ, তখন আমি সত্য সত্যই কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার মনে কি হচ্ছে না হচ্ছে লক্ষ্য করার কেউ কোনদিন ছিল না, নাই। এ রকম কেউ একজন থাকাটা যে কি আশীর্বাদ আমি কল্পনাও করতে পারতাম না। এই আশীর্বাদের স্বাদ আমি প্রথম পাই তোমার মুখ থেকে ঐ কথাটা শুনে। হ্যাঁ প্রভা, একমাত্র তোমার কাছেই নিজেকে আপন করে নেওয়া মনে হচ্ছে। সেই রাত থেকে। সেজন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। প্রবীরের গলা কেঁপে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার একটা হাত প্রভা তার নিজের মুঠোয় তুলে নেয়, আর সেই স্পর্শে প্রবীর শুনে ভাষাহীন হৃদয়-বার্তা। সে বলে, ব্যথা যত কঠোরই হোক আমি তা বয়ে বেড়াতে পারি। সইতে পারি না দরদের উষ্ণতা।

প্রভা প্রবীরের হাতে একটু চাপ দেয়, কিছু বলে না।

॥ দুই

প্রবীর প্রভার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার জীবন কাহিনীটা বলে। নৈর্ব্যক্তিক কাহিনীকারের ভাবভঙ্গী ধরে। সে যা বলে তাতে পুনরাবৃত্ত হবে না তথ্য বেশী কিছু থাকে না। নতুন যা কিছু তাতে থাকে সে সবের মুখ্যাংশ এই :—

রামতনু পুরকায়স্থ ছাড়া ঐ পরিবারে সবাই প্রবীরকে একটা জঞ্জাল ভাবতো। শশাঙ্কর বড় দু ভাই কদমতলার বাড়ীতে আসতো পূজা, বড়দিন এবং আম-কাঁঠালের ছুটির সময়। ওসব উপলক্ষে তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হতো। বাড়ির ছেলেমেয়েদের পেছনে তার স্পর্শকাতর মুখটা যেন কারো চোখেই পড়তো না। বাড়িতে রামতনুর দেখাশুনা করার দায়িত্ব ছিল তাঁর এক বিধবা ভগ্নী এবং বিধবা মেয়ের উপর। এক ঝাঁক চাকর-চাকরাণী এবং কয়েকজন আত্মীয়-পুত্রও থাকতো। এদের ভিড়েও প্রবীরের স্থানটা নিরানন্দ-ম্লান হতো।

তবু দিন কেটে যাচ্ছিল মোটামুটি সুখেই প্রবীরের। সে তখন নিজেকে নিরাত্মীয় বোধ করতো, কিন্তু নিরাশ্রয় কিম্বা নিঃসম্বল নয়। প্রমাদ ঘটে রামতনু মারা যাওয়ার পর। যে নিরাপত্তাবোধ তার একমাত্র সম্বল ছিল, যা তার আত্মবিশ্বাস এবং সাফল্য-স্বপ্নের খোরাক যোগাতো, তা এক নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অশৌচান্তের আগেই একদিন শশাঙ্কর বড় দু ভাই প্রবীরকে ডেকে বললেন, তোমাকে পরিবারের মধ্যে রাখা আর সম্ভব নয়। সবাই ভাবে তুমি শশাঙ্কর অবৈধ ছেলে, গ্রামের মুখ পুড়িয়ে ভেগে-যাওয়া সেই মেয়ে মানুষটা তোমার মা। শশাঙ্কর মতো ভাইয়ের স্মৃতিকে তাতে অপমানিত হতে দেওয়া হয়। তুমি বাপু সরে পড়। যত তাড়াতাড়ি পার।

প্রবীর চলে যায়। ম্যাট্রিক পাশ না করেই।

প্রভার কাছে দেওয়া বিবরণীতে এই ধরণের আরো দু একটা নতুন তথ্য প্রবীর দেয়। সব কিছুই সে বলে যায় অবিচলিত থেকে। একবার ছাড়া। তার মার মাতৃকুলের সঙ্গে কি করে তার একটু সংস্রব জন্মেছিল, সেটা বলবার সময়।

সাবিত্রী পুরকায়স্থর মাতৃপরিবার যে নেত্রকোনাবাসী ছিলেন, সে খবর প্রবীর জেনে গিয়েছিল বাল্যেই। তবে যেসব তথ্য তার কানে পৌঁছত, তার সবই মন্দার্থক হতো। মুখ্যতঃ দেবপ্রসাদের সুরা আসক্তি সম্পর্কে। উনি মাতাল। সেজন্যেই তাঁর পরিবার রসাতলে গিয়েছে। সাবিত্রীর পদস্খলনের হেতুটাও তাতেই দেখতো মানুষ। তবে দেবপ্রসাদ যে খুব কাবিল এবং বংশে কুলীন তাও বলা হতো মাঝে মধ্যে।

ওসব কথা শুনে শুনে প্রবীরের মনে দেবপ্রসাদের প্রতি একটা মুখচোরা সহানুভূতি জন্মে যায়। কিন্তু তার বয়েস যখন নয় কি দশ তখন হঠাৎ একদিন সে শুনতে পায় দেবপ্রসাদ মারা গেছেন। কেউ তাকে ডেকে সে-কথা বলে না। বাড়িতে এবং পাড়ায় ওঁর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে আলোচনা হতে শুনে সে। খবরটা শুনে তার মন একটা মোচড় খায়। ঠিক শোকবোধ থেকে নয়; যাঁর কথা তার ভাবতে ভাল লাগতো, তিনি আর বেঁচে না থাকায়।

দেবপ্রসাদের মৃত্যুর পর প্রবীরের মনে ঐ পরিবার বলতে একটি শোকার্তা এবং দৈন্য-মলিন বিধবা মূর্তি বোঝাতো। ওঁকে দেখারও আগ্রহ তার ছিল। তার মার চেহারা সে এক রকম ভুলেই গিয়েছিল। একটি ঘন চুলের শ্যামবর্ণার ভীতি-কাতর কল্পনা-মূর্তি ছাড়া তার স্মৃতিতে মার অবয়বের আর কিছুই পরিচিত-গ্রাহ্য ছিল না। তাই তার মাঝে-মধ্যে মনে হতো দেবপ্রসাদের বিধবাকে দেখলে হয়তো তার মার চেহারাটা আর একটু স্পষ্ট হবে। সাদৃশ্য-তাড়নায়।

তার বয়েস দশ পার হতেই রামতনু তাকে নেত্রকোনার সেই হাইস্কুলটাতে ভর্তি করে দেন। সে তখন ক্লাস সিক্স না সেভেনের ছাত্র। ওখানে ভর্তি হবার মাস কয়েকের মধ্যেই একদিন বিজয় রায় নামক নেত্রকোনাবাসী সহপাঠী তাকে বলে, আমাদের পাড়ার এক মহিলা তোকে দেখতে চান, যাবি?

প্রবীরের বুকটা ধক্ করে ওঠে। কে-রে মহিলাটি?

দেবপ্রসাদ দত্ত-মজুমদার নামের একজন উকিল ছিলেন না? ওঁর বিধবা স্ত্রী। উনি আমাকে এর আগেও দু-তিনবার তোকে নিয়ে যাবার জন্যে বলেছিলেন। চল না একদিন। খুব ভাল মানুষ উনি। আমরা সবাই ওঁকে সুমিত্রা দিদিমা বলে ডাকি।

চল্, তাহলে আজই আমাকে নিয়ে চল্।

প্রবীর যে সেদিনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলে আসবে, এ সম্ভাবনা

দেবপ্রসাদের স্ত্রী ভেবে রাখেন নি। তবু হঠাৎ বিজয়ের সঙ্গে দেখতে সুন্দর আর একটি ছেলেকে দেউড়ি পার হয়ে বাড়ির ভেতর চলে এসে যেতে দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ও কে। তিনি কেমন যেন বিচলিত হয়ে ওঠেন। খুশী, ভীতি, দুঃখে। হয়ত নিজেকে সামলে নেবার জন্যে তিনি জিগ্যেস করেন, তোর সঙ্গে এই ছেলেটি কে-রে, বিজয় ?

এই তো প্রবীর !

প্রবীর ! সুমিত্রা দত্ত-মজুমদারের গাল বেয়ে চোখের জল গড়াতে আরম্ভ করে। তাড়াতাড়ি মুখের ওপর আঁচল চেপে ধরে তিনি একটুক্ষণ কাঁদেন, কিন্তু নীরবে, মুখ ঘুরিয়ে,— কারো নাম না নিয়ে, কোন ঘটনার দিকে ইঙ্গিত না ফুটিয়ে। কান্না থামলে তিনি ভেতরে যেয়ে দুটো পিঁড়ি এনে দাওয়ায় পেতে দেন এবং বিজয়কে নাম ধরে উল্লেখ করে বলেন, তোরা বোস্, দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন ? তারা বসলে তিনি প্রবীরের দিকে চেয়ে, কিন্তু তাকে সম্বোধন না করে, জিগ্যেস করেন, তুই বাড়ি থেকে কখন খেয়ে বেরোস্ ?

সকালে, এই দশটা নাগাদ।

দুপুরে কি খাস্ ?

কিছু না। বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার ভাত খাই।

তাহলে তো তোর এখন ক্ষুধা পেয়ে গেছে। বোস্, আমি আসছি। তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে দুটো বাটিতে করে মুড়ি আর বাতাসা নিয়ে এসে ওদের দুজনের সামনে রাখেন। কিন্তু বিনয় খায় না, বাড়ি চলে যায়, দেরী হলে তার মা তাকে বকতে পারেন, এই ভয়ে। তার মুড়ির বাটিটা প্রবীরের দিকে ঠেলে দিয়ে সুমিত্রা সুন্দরী বলেন, তুই এ-কটা মুড়িও খেয়ে ফ্যাল। দাঁড়া একটু দুধ এনে দিচ্ছি।

সুমিত্রা দত্ত-মজুমদার ভেতর থেকে একটা বড় বাটিতে করে কিছু দুধ এনে ওতে ছোট দু-বাটির মুড়িগুলো ঢেলে নিয়ে প্রবীরের সামনে রাখেন। সে আপত্তি করে না, আপত্তি করার মতো আত্মবিশ্বাস কিম্বা অধিকার বোধ তার ছিল না। তাছাড়া একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে সে আত্মসচেতন হয়ে গিয়েছিল। কদমতলার গেঁয়ো পরচর্চা-আমোদীদের দৌলতে নিজের সম্পর্কে যা জানতে পেরেছিল তাতে সাবিত্রী-ই যে তার মা, সে সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছিল। দ্বিমত শুনতে পাওয়া যেতো শশাঙ্কই তার পিতা কিনা, সে সম্বন্ধে। সুমিত্রা দত্ত-মজুমদার তাকে দেখতে চান শুনে তার মাতৃ-পরিচিতি প্রমাণ-পোক্ত। তারা দুজনের

মধ্যে যে রক্ত-সম্পর্ক সে সম্বন্ধ-যুক্ত দুজন মানুষের প্রথম দেখায় যে সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ স্বাভাবিক বলে সে জানতো তা শুনবার জন্যে সে আকাঙ্ক্ষা-ব্যগ্র হয়ে এসেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয় নি। "দিদিমার" কাছেও তার জন্মের কলঙ্ক-ক্লিন্নতাটাই বড়। সে ব্যথাই পায়, তার মনে হীনমন্যতার ছায়া গাঢ়তর হয়।

ইতিমধ্যে সে দুধ মুড়ি খেতে আরম্ভ করেছিল। খাদ্য-আগ্রহে নয়, কোনমতে এই সাক্ষাৎকার-জাত করণীয়গুলো সেরে পালাবার ব্যগ্রতায়।

কিন্তু তার দুধ মুড়ি খাওয়াও সমাপ্ত হতে পারে না। দেবপ্রসাদের বাড়ির বৃহদাংশ ভাড়ায় খাটছিল। ভাড়াটে পরিবারের গিন্নী ঠাকরুণ তাঁর দু-তিনটি কাচ্চা-বাচ্চা সহ সেখানে হাজির হয়ে প্রবীরকে দেখতে থাকেন। নীরবে। অপরিচিত কেউ এসেছে শুনে তাকে দেখার জন্যে ওঁর মতো একজন প্রতিবেশীর চলে আসাটা অসঙ্গত কিছু নয়। কিন্তু প্রবীরের স্পর্শকাতর মন ওঁর চলে আসার পেছনে দেখে এক বেজন্মা ছেলে দেখার ঔৎসুক্য। তার গলায় মুড়ি আটকে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে আশেপাশের দু-একটা বাসা থেকে আরো দু-তিনজন মহিলা চলে আসেন সেখানে। কাচ্চা বাচ্চা সহ। সবাই তাকে দেখতে থাকেন। তবে কেউই এখন নীরব নয়। ভাগ্যকে দোষরোপ করে তাঁরা নানাপ্রকার সহানুভূতিসূচক মন্তব্য প্রকাশ করতে লেগে যান। সুমিত্রা দত্ত-মজুমদার চোখে আঁচল চেপে আবার একটু কাঁদেন।

বিব্রতাবস্থা চরম হয়ে উঠে প্রবীরের। সুমিত্রা-সুন্দরীর দিকে চেয়ে সে কাকুতি করে বলে, আমি আর খেতে পারছি না।

খেতে পারছিস না! কেন? যে কটা মুড়ি দিয়েছিলাম তার সবই তো পড়ে আছে?

শরীটা ভাল লাগছে না।

শরীরটা ভাল লাগছে না! তবে আর খেয়ে কাজ নেই। অসুস্থ হয়ে পড়লে বিপদের একশেষ হবে।

আরো দুচার কথা বলা-কওয়ার পর প্রবীর বিদায় নেয়। কিন্তু এতো ঘা সত্ত্বেও তার মন উদগ্রীব হয় সেই "আবার আসিস্" "বেঁচে থাক" কিম্বা অনুরূপ উপলক্ষ-শোভন কোন কথা শুনতে। কিন্তু সুমিত্রা দত্ত-মজুমদারের মুখ থেকে সে রকম কথা বেরয় না। বিদায় সম্ভাষণ মনে করার মতো কোন কথারই বিনিময় হয় না দুজনের মধ্যে।

বাড়ি ফেরার পথে প্রবীর সেদিন খুবই ব্যথা-বিহ্বল থাকে। সে জানতো,

সুমিত্রা দত্ত-মজুমদার যে ধরণের ব্যবহার করেছিলেন তাঁর কাছ থেকে ভিন্ন ব্যবহার আশা করাই যেতে পারতো না। সাবিত্রী পালিয়ে যাবার পর দেবপ্রসাদকে জাতে ঠেলা হয়েছিল। তাঁর মেয়ে এবং জামাইরাও তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ কেটে দিয়েছিল। যে দুটি ছোট ভাইদের তিনি মানুষ করেছিলেন তারাও। সামাজিক অত্যাচারের সেই হৃদয়হীন কাঠিন্য অনেকটা ইতিমধ্যে কমে গিয়েছিল। উদারমন্যতার ঢেউয়ে নয়। একুশ-বাইশ সালের অসহযোগ এবং খিলাফৎ আন্দোলনের ধাক্কায়। ঐ উপলক্ষে দেবপ্রসাদ তাঁর জীবনব্যাপি সুরাসক্তি এক কথায় ছেড়ে দিয়ে দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়ায় শুধু নেত্রকোনাই নয়, সারা ময়মনসিংহ জেলা আলোড়িত হয়েছিল। কারণ সবাই দেখতে পেয়েছিল, দৈন্য এবং দুর্ভোগ তাঁর কপালে যতই ভয়ানক এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাক, তাঁর প্রতিভা টিকেছিল। মাথায় এক ঝাঁক সাদা-কালো চুলে, শক্ত চোয়ালে, পেশল দেহে, এবং সর্বোপরি তাঁর সিংহ-গর্জনতুল্য গলার আওয়াজে। বস্তুত ঐ উপলক্ষই ছিল তাঁর প্রতিভার দিবাকর দীপ্তি। যেদিন তাঁকে ধরা হয় সেদিন সারা ময়মনসিংহ জেলায় হরতাল হয়, নেত্রকোনায় যুবকগোষ্ঠী তাঁর বাড়িতে এসে খেয়ে যায়,—নিজেদের খরচে কিন্তু সুমিত্রা দিদিমার হাত দিয়ে রাঁধিয়ে। কিন্তু সমাজ শাসনের অন্যায় এবং অত্যাচার আশ্রিত দিকটার অজেয় শক্তিও থাকে অপরাভূত। অসহযোগ আন্দোলন থেমে গেলে দেখা যায় দেবপ্রসাদের আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে একঘরে করেই রাখছেন। তাঁর দশ-দশটি মেয়ে এবং দুজন ভাইয়েরাও। তাদেরও কেউ তাঁর বাড়িতে পা রাখে না, খাওয়া-টাওয়া তো দূরের কথা। সমাজের শুধু একটি অংশে তাঁর পুনঃ-প্রতিষ্ঠা অমর হয়ে থাকে। শিক্ষিত যুব-সমাজের যারা রাজনীতি সচেতন, তাদের মধ্যে। বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদী মহলে। গ্রামের গল্প-প্রেমীদের দৌলতে এ সব কথাও প্রবীর জেনে গিয়েছিল। তবু সে সেদিন সুমিত্রা দত্ত-মজুমদারের ব্যবহার মনে করে নিজেকে ব্যথা-নিপীড়িত করতে থাকে। স্বেচ্ছায়, নির্বিরতিতে। স্কুলে যাওয়া-আসা করতো সে একা একা। তবে সে ভাল ছাত্র। গ্রাম থেকে নেত্রকোনায় পড়তে আসতো ছেলেদের অনেকেই তার সঙ্গ নিতে চাইতো। কেউ কেউ কোন কোনদিন তাঁর সঙ্গে সেঁটে থাকতো। কিন্তু সেদিন বাড়ি ফিরতে তার দেরী হয়ে গিয়েছিল। সূর্য অস্ত যাবার সময় হয়ে আসছিল। ও সময় একা বাড়ী ফিরতে তার খুব ভাল লাগতো। রাস্তার প্রায় সবটারই দুপাশে খাল-বিল এবং বড় মাঠ। চৈত্র মাস। মাঠ শুকনো। চষা জমির রৌদ্র-পোড়া

মাটির গন্ধ আকাশে বাতাসে। সর্বত্র পোষা গরু-বাছুরের ছড়াছড়ি। রাখাল সংখ্যাও কম না। বিলে মৎস্য-শিকারীরা ছিপ, কোঁচ, পোলো, জাল ইত্যাদি নিয়ে। কেউ কেউ ডাঙ্গায়, কেউ কেউ ছোট ছোট ডিঙ্গিতে। চৈতী হাওয়া উদাসীনতা-কোমলতা। সবে মিলে এক আশ্চর্য প্রশান্তি, কিন্তু প্রবীরের মনে ঝড়। ডেকে নিয়ে তাকে এই আঘাতটা দেওয়ার জন্যে সুমিত্রা দত্ত-মজুমদারের প্রতি তার মনে তিক্ত আক্রোশ।

একটা কথা কিন্তু সে লক্ষ্য করে না। জীবনে সে আর কারো প্রতি কখনো আক্রোশ ভাবাপন্ন হয়নি। কারো কথাই সে কখনো একটানা ভাবতো না।

কিন্তু সুমিত্রা দত্ত-মজুমদারের সঙ্গে তার সেই সাক্ষাৎকারের শেষাঙ্ক প্রবীরের বাল্যজীবনের একটি মাত্র স্মৃতিমধুর অভিজ্ঞতা। পরদিন স্কুল আরম্ভ হবার তখনো কিছু বাকি। স্কুল প্রাঙ্গনস্থিত একটা বট গাছের ছায়ায় সে দাঁড়িয়ে। একা। আসে সেখানে সহপাঠী বিজয়। প্রবীরের দিকে একটি কৌটো বাড়িয়ে সে বলে, সুমিত্রা দিদিমা তোর জন্য এটা পাঠিয়েছে।

ওতে কি আছে?

জানি না, খুলে দেখিনি। নে, ধর্।

সুমিত্রা দত্ত-মজুমদারের প্রতি তার আক্রোশ যতই থাক, কৌটোতে কি আছে দেখার ঔৎসুক্য সে দমিয়ে রাখতে পারে না। গাছটার আড়ালে যেয়ে ওটা সে খুলে আর অমনি এক অবর্ণনীয় স্নেহ-তরঙ্গ তার সর্ব শিরায় কেঁপে বেড়ায়। চোখ দুটোও সজল হয়ে ওঠে। ওতে ছিল সরু ধানের কিছু চিঁড়ে, তিন-চারটে সদ্য তৈরী দুধের নাড়ু, আর দুটো সন্দেশ।

॥ তিন ॥

কিন্তু প্রভা তার ব্যথাটা কি প্রবীরকে বলতে পারে না। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। দিন দুই পর প্রবীর বাস থেকে পড়ে গিয়ে একটা পায়ে আঘাত পায়। আর এরও মাত্র কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যায় "হে রাম" মুখে নিয়ে মহাত্মা গান্ধী ধরাশায়ী হন,—প্রার্থনা-বেদিতে, করজোড়ে, তাঁর জনসম্ভাষণের অভ্যস্ত ভঙ্গীতে।

ইতিমধ্যে প্রবীরের অসুস্থতা প্রায় সেরে এসেছিল। সেদিন সন্ধ্যা যখন হতো

সাড়ে ছটা হবে, তখন ওপরের ভদ্রলোক হঠাৎ প্রায় ছুটে এসে ঘরে ঢোকেই বলে ওঠেন, জানি না শেষ পর্যন্ত খবরটা একটা গুজব হবে কি না, তবে এইমাত্র শুনলাম গান্ধীকে মেরে ফেলা হয়েছে।

প্রবীরের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নিঃসংবিত। হঠাৎ দেহের কোন অংশ কেটে গেলে যেমন হয়। সে শুধু বলে, কি বলছেন!

ভদ্রলোক এসেছিলেন কানুর খোঁজে। প্রবীরকে তিনি ঠিক পরিচিত প্রতিবেশী মনে করতেন না। মুখোমুখী দেখা হয়ে গেলে যে ভদ্রতাবহ ব্যবহার করতেন তাতে সেই ইঙ্গিতটা থাকতো। কার সঙ্গে এখন কথা হচ্ছে সে বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে তিনি হৃত-উচ্ছাস। বলেন, যা শুনে এলাম, তাই বললাম। খবরটা মিথ্যা হবে বলে মনে হয় না। শহরে কোন কোন মহল্লায় মিষ্টি-টিষ্টিও বাটা হয়েছে। আচ্ছা আসি এখন। এখনো জামাকাপড় ছাড়া হয়নি।

প্রবীর ইতিমধ্যে তার চিন্তা এবং অনুভব শক্তি ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু সে ভদ্রলোককে বিদায় দেয় নীরবে। কথা সে ফোটাতেই পারে না। সে সাংবাদিক। স্বাধীন ভারতে যে কোন কোন মহল গান্ধীজীর কার্যকলাপ অনুমোদন করতে পারছিল না, সে জানতো। তাঁকে হত্যা করবার জন্যে ষড়যন্ত্র চলার একটা জনরবও শোনা যাচ্ছিল। কয়েকদিন আগে তাঁর সান্ধ্য-প্রার্থনায় একজন সশস্ত্র মানুষ ধরা পড়া উপলক্ষে ঐ জনরব বিশ্বাস-সমর্থন পেয়েছিল। তবু তাঁকে হত্যা করা হয়ে যেতে পারবে এবং সে খুশীতে মিষ্টি বিতরণ করা পর্যন্ত হবে, এ কথা ভাবতে প্রবীরের বুক ফেটে যাচ্ছিল। সারা বিশ্ব যেন অসার হয়ে গিয়েছিল, ডুবে গিয়েছিল একটা প্রতিকূলতা-গর্ভ শূন্যতায়।

ওপরের ভদ্রলোক এসে যাওয়ায় সে লেখা থামিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। উনি চলে গেলেও সে দাঁড়িয়েই থাকে। ঠায়। কিন্তু অচিরেই সে চলে যায় একটা জানালার পাশে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কেন সে ওখানে যায় সে বোঝে না। বিরাট একটা অভাব বোধ তাকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় না। শীতকাল। সাতটাও বাজেনি। তবু রাত বেশ ঘনিয়ে আসা মনে হয়। জানালাটা মাঠ মুখো। মাঠের ওপাশে সারি সারি তাল-নারকেল গাছ, তারপরেই সমুদ্র। কিন্তু অন্ধকারে সব একাকার। মাঠ-গাছ-পাথর-সমুদ্র সবই এক অন্তহীন তমিস্রা,—না, লুকিয়ে ছাড়া এক দীর্ঘশ্বাস।

আশপাশের দু-একটা বাড়ির রেডিও থেকে ভেসে আসে রামধুন। হঠাৎ। প্রবীর হয় সমব্যথী চেতন। বিশ্বব্যাপী শূন্যতাটা অশ্রু-অজল হয়ে ওঠে। দুঃখীর

মহাত্মা! তাঁর জন্যে কাঁদবার লোকের অভাব হতে পারে? জগৎটাই যে দুঃখীতে ভরা। ঐ তাদের রোদন ধ্বনি! চাপা কিন্তু মর্মভেদী। প্রবীরের চোখ জলে ভরে যায়। পড়তে থাকে তা গাল বেয়ে। প্রথমতঃ ফোঁটা ফোঁটা করে, অচিরেই দুটি ধারায়। ঠিক দুঃখে নয়। কৃতজ্ঞতায়। দুঃখীর মর্মব্যথা রেডিওতে শোনা যেতে থাকায়। প্রতিকূলতা-শীতল শূন্যতা হয়ে ওঠে অশ্রু-উষ্ণ। সেই শোকাচ্ছন্ন জগতের খোঁজে তার মনে জাগে এক ব্যথা-মধুর একাত্মবোধ। ঘরে থাকতে আর ইচ্ছে হয় না। সে বেরিয়ে পড়ে। পায়ের ব্যথাটা ভুলে গিয়ে।

মাঠমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাতে একটা ব্যাপার তার লক্ষে আসেনি। বাইরে শত শত লোক রাস্তায় নেমে আসছিল। নীরবে, শোকস্তব্ধ হয়ে। অন্ধকারে গাল বেয়ে ঝরতে থাকা অশ্রুধারার মতো। অশ্রু কান্না নয়, কান্নার সঙ্কেত। এই জনস্রোতও জাতীয় ব্যথার স্বরূপ নয়, তার সঙ্কেত। এটা দীর্ঘশ্বাস। স্তব্ধ, অস্থির, ব্যথাভারী। ঘর থেকে বেরনো মাত্রই প্রবীরের বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। অশ্রু-উষ্ণ একাত্মবোধের নতুন উচ্ছ্বাসে।

রাস্তায় জনার্ণব জনরবমুক্ত। চেঁচামেচি, ডাকাডাকি, বুলিবাজি কিছুই নাই। মানুষ নীরব নয়, মৃদু কিংবা স্বল্পবাক, অধিকাংশই গতিশীল। কোথায় যাবার জন্যে তারা ব্যাকুল কেউ জানে না। তারা শুধু হাঁটছে। ধীর পদক্ষেপে,—একা একা, জোড়ায় জোড়ায়, ছোট বড় দলে। তবে তাদের গতিমুখ শহরের দিকে। প্রবীর ওই জনস্রোতে মিশে যায়।

আকাশবাণী থেকে পরিস্থিতিটা স্বীকৃতি-সমর্থিত করে দেওয়া হয়। গান্ধীজী আর বেঁচে নেই। ক্ষমা-প্রশান্ত মুখে নিরস্ত্র রণ-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা সশস্ত্র আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। হন্তা যে বিধর্মী নয়, সে খবর পাকিস্থান রেডিও থেকে বার বার ঘোষণা করা হয়েছিল। সেটাও এখন স্বীকৃতি সমর্থিত। আততায়ী হিন্দু, ব্রাহ্মণ।

যেতে যেতে রাস্তার দুধারের এ বাড়ি সে বাড়ির রেডিও থেকে রামধুন ভেসে আসতে থাকে। থেকে থেকে। "ঈশ্বর আল্লা তেরো নাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান……" এই কলিটা প্রবীর কতবারই না শুনেছে জীবনে। গান্ধীজী যখনই বোম্বেতে এসেছেন, তখনই সন্ধ্যেয় তাঁর প্রার্থনা সভায়। সে ওখানে যেতো সাংবাদিকের ভূমিকায় নয়, এমনিতে, ভাল লাগতো বলে। এই একটা উপলক্ষ ছিল যখন সে তার অভ্যস্থ দৈনন্দিন কর্মসূচী বাতিল করে দিত। তখন যতবার সে রামধুন শুনতো, ততবার সে তাতে অনুভব

কয়তো সংবেগতা-স্নিগ্ধ সাধারণত্ব-আশ্রিত গণ-মনোভাবের ব্যঞ্জনা। সেদিন সেটা শোনাচ্ছিল আরো করুণ, আরো পার্থিবতা-মধুর, আরো প্রার্থনা-কোমল। মৃত্যু-মহিমায়।

রামধুন আর এখন থেকে থেকে রেডিওতেই হচ্ছিল না। যে জনস্রোতে সে ভেসে চলছিল তাথেকেও গাওয়া হচ্ছিল। চাপা গলায়, কিন্তু শত শত স্ত্রী-পুরুষের সমবেত কণ্ঠে। সেটাও লক্ষ্যে আসাতে তার সারা গা দিয়ে বয়ে যায় এক অদ্ভুত আবেগ শিহরণ। এক অনন্ত জনসমুদ্রের সঙ্গে শোকাচ্ছন্ন জ্ঞাতিত্ববোধ। সেও সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে রামধুন গাইতে থাকে। জীবনে সর্ব প্রথম।

জনস্রোত এখন জনজলধি। এখন ওতে গতিচাঞ্চল্য আছে, নেই গতিশীলতা। হাজারে হাজারে বোম্বেবাসীরা নেমে এসেছিল রাস্তায়। কোন উদ্দেশ্যে নয়। শোক-চাঞ্চল্যে। এখানে সেখানে সর্বত্রই মানুষ, কেবল মানুষ। একা একা কিম্বা দলবদ্ধ, দাঁড়িয়ে কিম্বা পায়চারিরত।

প্রবীর নিজে তখন লালবাগ নামক একটা শ্রমিক মহল্লায়। ওটার বুক চিরে যাওয়া বড় রাস্তার ওপরই। এখানে জনমনের শোকাচ্ছন্নতা আরো গভীর, আরো জ্ঞাতিত্ব-বন্দী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখানে হারিয়ে গেছে এক শোক-চঞ্চল অসীমতায়। কিন্তু আবহাওয়া এখানে প্রতিঘাত চঞ্চলও।

এর অর্থ কি, প্রবীর বোঝে না, বোঝাবার ক্ষমতাই সে হারিয়ে ফেলে। মোচড় খাওয়া পা-টায় আবার ব্যথা দেখা দিয়েছিল। সারে সারে অবস্থায় চার পাঁচ মাইল হাঁটা হয়ে যাওয়ায় মোচড় খাওয়া গাঁটটা টন টন করছিল, সারা পা-টা হয়ে উঠেছিল এক ফোলা-ফাঁপা অসারতা। গায়ে জ্বরও চড়েছিল প্রচণ্ড। হাঁটা তো দূরের কথা, দাঁড়িয়ে থাকাও যন্ত্রণাদায়ক। অসহ্য। সে ইতিমধ্যে বসেই গিয়েছিল। পেভমেন্টের ধারে এক বন্ধ দোকানের দরজায় হেলান দিয়ে। কি করে বাড়ি ফিরবে সে-কথা ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করার বা ভাববার অবস্থা তার আর ছিল না।

সে ওখানেই পড়ে থাকবে না। দুজন পরিচিত শ্রমিক নেতা তাকে ওখানে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাকে বাড়ি পৌছিয়ে দেওয়াবেন। সেখানে, বিছানায় পড়ে রোগে ছটফট করতে করতে সে খবরের কাগজ, রেডিও এবং বন্ধু-বান্ধবের কথা থেকে জানতে থাকবে গান্ধী হত্যার প্রতিক্রিয়ায় সারা ভারত নয়, সারা ভারত উপমহাদেশ নয়, সারা বিশ্ব শোকাচ্ছন্ন, অবিশ্বাস-বিহ্বল।

তখন সে জানবে আমেরিকার নিগ্রোরা যে যেখানে আছে সেখান থেকে রেডিও দিল্লীর সঙ্গে সংযোগ-বদ্ধি, পাকিস্তানে যেখানে যেখানে গান্ধী-স্মৃতি জড়িত সেখানে সাধারণ মানুষ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কেউ কাঁদছে, কেউ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সামনের স্মৃতিচিহ্ন যাই হোক, সেদিকে। করাচীতে দু-একজন মানুষের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার খবরও ভেসে আসবে রেডিওতে। আর ভারতে? এই বিশাল দেশটা মনে হবে এক শিলীভূত কান্নার নিঃসীমতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

প্রবীরের মোচড় খাওয়া গোড়ালিটা সেরে যায় অচিরেই, কিন্তু পা-টাতে দেখা দেয় ফ্লেবাইটিস। বিদকুটে ব্যারাম। বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া এর আর কোন মোক্ষম চিকিৎসা নাকি নাই। আর এই বিশ্রামই হয় তার এক দুর্ভোগ।

ইতিমধ্যে স্মৃতি-নিকেতনে অবস্থান-শর্তও অনেক পাল্টে গিয়েছিল। কানুর প্র্যাকটিশ জমে উঠতে থাকায় সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত। সুরেশের দল বিপ্লব ঘটানোর উদ্দেশ্যে অভিযান ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সে তাই গা ঢাকা দিয়ে থাকছিল। প্রভা তো তার মাসীর বাড়িতে থাকছিল কিছুকাল আগে থেকেই। অম্বাও চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। তার কৃপাভাজনটির ডাকে। বাড়িতে এখন নতুন পরিচারিকা। এটি কাজকর্মে ভালই। ছিল না ওর মধ্যে অম্বার সেই প্রাণ-চাঞ্চল্য। অসুস্থ প্রবীর সময় কাটায় বই পড়ে কিম্বা লিখে-টিকে।

একদিন এক অপরাহ্নে তাকে দেখতে আসে এমন একজন যাকে দেখে সে অবাক আনন্দে আত্মহারা। শিপ্রা। প্রবীর রোগ-শয্যায় পড়ে আছে বলে নয়।

তেমন কাঁচা কাজ করবার মানুষ ও ছিল না। প্রবীরের অসুস্থটাকে খোঁজ নেবার মতো কিছু মনে হতেও দেয় না ও। তোমার নাকি স্লেবাইটিস হয়েছে? তবে আর কি? খাও-দাও ঘুমোও। শিপ্রা বসে যেয়ে ঘরের আসবাবপত্রগুলো একটু পরীক্ষা করে দেখে। আচ্ছা, এখন শোন আমি কেন এসেছি। একটা বই লিখে ফেলেছি। অবাক লাগছে, না? নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না, কুকীর্তিটা আমার।

শিপ্রা তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা চটি প্যাকেট বার করে প্রবীরের রুগ্ন-শয্যায় রাখে। বেরিয়েছিল ওটা সপ্তাহ দুই আগেই। কিন্তু ঠিক তার পরই গান্ধীজির মৃত্যু ঘটে। তখন বই-টই-র কথা আর মনেই থাকে না। শিপ্রা একটু চুপ থেকে আবার বলে, জান, গান্ধীজি মারা যাবার পর দু-তিন দিন খেতে শুতে পারিনি। অবশ্য স্বচ্ছন্দে। না খেয়ে তো আর থাকা যায় না? কিন্তু যতবার খেতাম, ততবার ভাবতাম জীবন কি অদ্ভুত! এমন একটা ভয়ানক দুর্ঘটনার এতো অল্প সময়ের পরও খেতে পারছি! তবে আমি কেঁদেছিলাম। ওঁকে সত্য সত্যই হত্যা করা হয়েছে শোনার পর। যাক্ ওসব কথা ভেবে আর লাভ কি? কিন্তু একটুক্ষণ চুপ থেকে ও-ই আবার বলে, একটা কথা ভেবে আমি সান্ত্বনা পেতাম। যে যুগে এবং যে দেশে ওঁর জন্ম সেই যুগে এবং সেই দেশে আমার জন্ম হওয়ায়।

ঝি চা-জলখাবার নিয়ে আসে। শিপ্রা আরো নানা কথা বলে যায়। চা খেতে খেতে। প্রবীর ভাবতে থাকে। যে-কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনার সঙ্গে আবেগ-আশ্রিত ব্যক্তিগত সংস্রব ফোটানো শিপ্রার সংলাপ-শৈলীর বৈশিষ্ট্য ছিল। তাতে সঙ্গতির কোন বালাই ছিল না। একদিনের উক্তি আর একদিন খণ্ডন করতে ওর বাধতো না। আসলে মতবাদ বলতে ওর কিছু ছিলই না। যখন যা উপলক্ষ-শোভন মনে হতো তাই ও বলে যেতো।

শেষ চুমুক দেওয়ার পর হাত থেকে চা'র কাপটা নামিয়ে রেখে শিপ্রা মুখ মোছে। ব্লাউজের নীচে থেকে রুমাল বার করে। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী-চর্চাও চাপা পড়ে যায়। আমার বইটার কিন্তু একটা দারুণ ভাল রিভিউ লিখতে হবে, মনে থাকে যেন। শিপ্রা প্রবীরের দিকে চেয়ে থাকে।

এতক্ষণ ধরে প্রবীর হুঁ-হ্যাঁ এবং আতিথেয়তাধর্মী দু-এক কথা ছাড়া একদম চুপ ছিল। তাকে কিছু বলার সুযোগও দেওয়া হয়নি। উপলক্ষ বিশেষে, বলতে না দেওয়াটাও ছিল শিপ্রার একটা সংলাপ-শৈলী। প্রবীর বলে, আর কাউকে

দিয়ে রিভিউ লিখিয়ে নাও না। শরীরের যা অবস্থা, কবে যে কাজে ফিরে যেতে পারব জানি না।

সে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। অন্যান্য সব কাগজের সঙ্গে 'দ্যা এরিনা'কেও কপি দেওয়া হয়ে গেছে। তোমাকে বলছি তোমার সাপ্তাহিক কলমটাতে বইটার চমক-জাগানো সমালোচনা লিখতে। অসুখ থাকা সত্ত্বেও তো কলমটা লিখে যাচ্ছ। সুতরাং ওজর-আপত্তি কিছুই শুনব না। বুঝলে?

একদিন মধ্যাহ্নে মিলনসূচী ভেস্তে যাবার পর দুজনের এই প্রথম সম্প্রীতি-সাক্ষাৎ। এর মধ্যে নানান উপলক্ষে তারা মুখোমুখি হয়েছে। বাক্যালাপও করেছে; কিন্তু মোলাকাত বলতে যা বোঝায় তা হয় নি। কার্যতঃ তাদের বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিঁড়েই গিয়েছিল। যা টিকে ছিল তা পেশাগত সদ্ভাব। কিন্তু প্রবীরের মনের তলায় শিপ্রা-আরাধনা অটুট ছিল। বইটা নিয়ে ওর জেদ তার প্রণয়-পিপাসায় আলোড়ন জাগায়। সে ভাবটা চেপে রাখার প্রয়াসে সে শিপ্রার বইটা খুলে দেখতে যায়। শিপ্রা সট করে তার হাত থেকে প্যাকেটটা ছিনিয়ে নেয়। না, এখন নয়, আমি চলে গেলে।

প্রবীরের মন আবার দোল খায়। কিন্তু শিপ্রাকে সেটা বুঝতে দিতে চায় না সে। সে বলে, বইটার এখনো কোন রিভিউ বেরোয় নি, না?

আমি নিজেই সেটা চাইনি। গান্ধীজী মারা যাওয়ার অব্যবহিত পরই সেটা ভাল হতো না। কিন্তু তোমাকে রিভিউটা তাড়াতাড়ি লিখে ফেলতে হবে। নইলে কি হয় বলা যায় না। বইয়ের প্রথম রিভিউটা ভাল হলে অন্যান্য সমালোচকরাও ভাল লেখে। আমার বইয়ের রিভিউ তোমার চেয়ে ভাল কে লিখবে, বল? প্রথম রিভিউটা তোমার কলমে বার হওয়া চাই-ই। এতে কোন ওজর-আপত্তি খাটবে না।

শিপ্রা একটু চুপ করে কি যেন একটা ভাবে। প্রবীর তা লক্ষ্য করে, কিন্তু আড়চোখে। বিছানার চাদরটা একটু টেনেটুনে নেবার ভান করে করে। শিপ্রা বলে, আচ্ছা, এবার চলি। ও চলে যায়।

শিপ্রা চলে যাওয়া মাত্রই প্রবীর অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়ে। ঘণ্টা দেড়েক বসে থাকার ক্লান্তিতে। কিন্তু ভাবতে থাকে সে শিপ্রার কথাই। না ভেবে পারে না। সেই মধ্যাহ্ন-মিলন ভেস্তে যেতে দেওয়ার পর তার প্রতি ওর মনোভাবে বিতৃষ্ণা-বিষ জন্মানোর কারণটা কি, সে ভাল করেই বুঝে গিয়েছিল। ব্যর্থ অভিসার। অফিস

কামাই করে রৌদ্রতাতা হয়ে সেদিন ওর স্মৃতি-নিকেতনে আসার পেছনে ছিল সঙ্গম-তৃষ্ণা। ও বিহার আমোদী। ব্যাহত অভিসারের ঝাঁকানি সইতে পারেনি। কিন্তু রিভিউ-এর জন্যে বই দিতে এসে ও বিতৃষ্ণা-বিষ দেখায় নি। প্রণয়-ইঙ্গিতও দেয়নি। বরং গান্ধীজীর হত্যা প্রসঙ্গটা তুলে সাক্ষাৎকার ভব্যতা-সুষম করেছে। এটাই ওর বাহাদুরী। বেয়াড়া ওর সুবিধাবাদ। কিন্তু সেটাকে ঢেকে রাখে ও সংলাপ-শৈলীর জোরে। তার মনে পড়ে, ও যুগকন্যা। ভিন্ন সংস্করণের। পারম্পরিকতার ব.ন্দশালা থেকে মুক্তি ছিনে নিয়ে এসে ও ছেলে-জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা-বন্দি হয়ে সমান অধিকার কায়েম করছে। বুলি বা বক্তৃতা না ঝেড়ে। ওর জীবন-প্রেরণা কোনো আদর্শবাদ নয়, উপার্জন নির্ভর আত্ম-প্রতিষ্ঠা। প্রবীরের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়। নিজের অজান্তে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। ঘর অন্ধকার। সে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে। বিছানার পাশে ছোট টেবিলে জ্বলে ওঠে আলো। সে শিপ্রার দিয়ে যাওয়া প্যাকেটটা খোলে। খোলা মাত্রই তার মন দুলে ওঠে এক লহর প্রশংসা-তরঙ্গে। বইটার নাম “খোপার ইতিহাস”। অবশ্য ওটা ইংরেজীতে লেখা। তাই নাম “দ্যা হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান হেয়ার-ডু।” কিন্তু তার প্রশংসা-উচ্ছল হবার কারণ বইটার নাম নয়, বিষয়বস্তু।

প্রথম পাতাটার ওপর চোখ বুলোয় প্রবীর। লিপি-নৈবেদ্য মনোহর। এক পাতা এক পাতা করে পড়তে পড়তে সে ওতে ডুবে যায় পাঠমুগ্ধ হয়ে। ঝি খাবার নিয়ে আসে। সে চমকে ওঠে। সাড়ে আট-টা বেজে গেছে। এক নাগাড়ে দেড় ঘণ্টা ধরে সে পড়েছে। পৃষ্ঠার দিকে চেয়ে দেখে বইটার অর্ধেকেরও বেশী পড়া হয়ে গেছে। খেতে খেতে সে বইটা সম্পর্কে ভাবতে থাকে। শিপ্রার ভাষা আটপৌরে কিন্তু সাহিত্যিকতা-নিপুণ। একটা নামজাদা ইংরেজী পত্রিকায় প্রতিযোগীতা জিতে চাকরী বাগিয়ে নিয়েছিল এই লিপি বৈশিষ্ট্যের জোরেই। কিন্তু সেটাই বইটার প্রধান আকর্ষণ নয়। এতো স্বচ্ছ বিষয় অনুধাবন এবং সংক্ষিপ্তি-সুন্দর তথ্য বর্ণনা সে অন্য কারো লেখায় দেখেছে বলে তার মনে হয় না। বইটা ঠিক খোঁপার ইতিহাস নয়। ভারতীয় ইতিহাসের একটা সংস্কৃতিক পার্শ্ব-চিত্র। খোঁপার বিবর্তন ইতিহাস এর অস্থি-কাঠামো, সিন্ধু-সভ্যতা থেকে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ সময়-সীমা। অথচ মাত্র একশো পাতায় সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে। সচিত্র। আশ্চর্য।

প্রবীরের বুকটা টনটন করতে থাকে। শিপ্রার সঙ্গে তার বন্ধুত্বের ইতিহাস সে আবার মনে করতে থাকে। নিরাশা-স্তব্ধ হয়ে।

॥ দুই ॥

হঠাৎ প্রবীরের চাকরিতে নিরাপত্তা-সমস্যা দেখা দেয়। অকল্পিত কারণে। ব্যক্তি জীবনে সে রাজনীতি এড়িয়ে থাকতো। অথচ তার চাকরীতে অস্থায়িত্ব-ছায়ার কারণ হয় রাজনীতি। সংসর্গ দোষে।

সমস্যাটা দেখাও দেয় অদ্ভুত ভাবে। তাকে একদিন ডেকে পাঠান সংস্থার বড় কর্তা। তার আট-ন বছর ব্যাপী চাকরী জীবনে প্রথমবার। তোমার লেখা কিন্তু কিছুদিন থেকে তেমন আর পাঠক-প্রিয় হচ্ছে না, প্রবীর।

প্রবীর চমকে ওঠে। সে যতদূর জানে, তার লেখার লোকপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওতে স্বাধীনতা উত্তর জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সুচিন্তিত আলোচনা এবং সমালোচনা পাওয়া যেতো বলে। কিন্তু সে কথা তো আর সংস্থার সর্বোচ্চ মহলে বড় গলায় জাহির করা যায় না! সে বলে, কি জানি, আমি তো যেমন লিখতাম তেমনি লিখে যাচ্ছি।

সেটা তোমার মত, আমাদের নয়।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে বাক্-বিরতি। দুপক্ষেই। সেটা ভাঙ্গেন বড় কর্তা। আমি শুনলাম সুরেশ পেটেল এবং প্রভা শাহ তোমার সঙ্গে থাকে?

থাকতো, এখন আর থাকছে না। তাছাড়া, আমি যেখানে থাকি সে বাড়িটা আমার নয়, অন্যের।

তা-ও আমি জানি। কানু জরিওয়ালা আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জামাই। কিন্তু সে-ও তো একবার জেলে গিয়েছিল। বিপ্লব-টিপ্লব না কি সবে জড়িয়ে গিয়ে। নয় কি?

হ্যাঁ, একবার ও জেলে গিয়েছিল, কিন্তু সে পুরনো কথা?

পুরনো কথা না লুকনো কথা?

প্রবীর এবারও কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। বড় কর্তাও তার কাছ থেকে জবাবের অপেক্ষায় থাকেন না। রোজ সন্ধ্যায় তোমাদের ওখানে যারা আড্ডা

জমাতে আসে তারাও তো বিশেষ একটা রাজনৈতিক দলের সদস্য কিম্বা সমর্থক, নয় কি?

প্রবীর আবার কোণঠাসা। বলে, ওরাও আর ওখানে আসে না।

আসবে কি করে? সবাই তো গা-ঢাকা দিচ্ছে। ওদের দলও তো বে-আইনী করা হয়ে গেছে! না, তুমি বলতে চাও ওসব খবর-টবর তোমার জানা নেই?

প্রবীর আবার চুপ। তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক লহমা চেয়ে থেকে বড় কর্তা বলেন, আমি সব খবর রাখি। সব দিকে নজর রাখতে যদি না পারতাম তবে এতো বড় একটা সংস্থা চালাতে পারতাম না। যাক্‌, আমার কর্মচারীরা ব্যক্তিগত জীবনে কি করে না করে সে খোঁজ রাখার দায়িত্ব পুলিশের, আমার নয়। কিন্তু বাইরে তুমি যা ইচ্ছা কর, অফিসে তোমাকে অফিসের কাজ করতে হবে। তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, অফিসের সময় বিপ্লবের কাজ করা চলবে না। কাগজটা আমার, তোমাদের দলের নয়। তোমার কলমটা লেখ তুমি, কিন্তু লেখাই আমি। সে কথাটাই তোমাকে বলে দিতে চাচ্ছিলাম।

বড় কর্তার ঘর থেকে প্রবীর বেরিয়ে আসে উৎকণ্ঠা-নিষ্পিষ্ট হতে হতে। একটা মাত্র দুর্যোগ তার কাছে সবচেয়ে বিভীষিকাময়ী ছিল। বেকারী। এর সঙ্গে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

কিন্তু প্রবীরের এই বেকারী-ভীতি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তার সংগ্রামজাত আত্মবিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তার মনে পড়ে যায়, সে আর স্রেফ একজন চাকুরে নয়। সে এখন একজন লিপি-সংগ্রামী। দুঃখ দৈন্য দুর্দশা যত ভয়ঙ্করই হোক, সংগ্রামরত মানুষের কাছে সব রণ-উদ্দীপনার খোরাক। তার প্রথম উপন্যাসটা এখন প্রকাশকের হাতে। ওটা যদি অনুমোদিত নাও হয়, সে নিজের খরচেই ওটা ছাপাবে। বেকারী-ভীতির বিরুদ্ধে সেটাই হবে তার যুদ্ধ ঘোষণা।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে পরিস্থিতিটা সে কিন্তু সব দিক থেকে খুঁটিয়ে দেখে। প্রায় ছ-সাত দিন ধরে। প্রথমেই সে ভাবে অন্য কোন কাগজে চাকরী খোঁজা কর্তব্য কিনা। দু-একটা কাগজের অফিসে উচ্চ মহলকে বাজিয়েও দেখে। না, চেষ্টা করলে অন্যত্র কাজ পাওয়া খুব মুশকিল না। কিন্তু তার মন তাতে সায় দেয় না। সে রাজনীতি করে না কিন্তু রাজনীতি জ্ঞান রাখে যথেষ্ট। পেশা, সংসর্গ এবং অনুসন্ধিৎসা থেকে। তার একটা তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক

সংজ্ঞাও ছিল। অফিসে যা ঘটেছে তার ঝাঁকানিটা তার ব্যক্তিজীবনে পড়লেও ওতে সে একটা অবাঞ্ছনীয় যুগ-সঙ্কেত দেখতে পায়।

ভারতে সাংবাদিকতা জাতি-সত্তার একটা প্রধান অঙ্গ। জাতি-সত্তার জন্ম শর্ত ছিল পরাধীনতা। মুক্তি সংগ্রাম হয় জাতি-সত্তার জীবন শর্ত। ফলে সাংবাদিকতার ঝোঁক এবং চরিত্রও হয়ে যায় সংগ্রামপ্রবণ। কিন্তু আজ দেশ স্বাধীন। জাতি-সত্তার জীবন শর্ত মুক্তি সংগ্রাম নয়, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন। কিন্তু তাতে জাতীয়তাবাদের স্থান এবং ভূমিকা? স্বাধীনতা মানে স্বদেশী শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু শাসন-শক্তি? তার উৎস এবং চরিত্র? ভারতের স্বদেশী রাষ্ট্রশক্তি জন-প্রতিনিধি, শ্রেণী-স্বার্থ সমর্থক, না মুক্তি সংগ্রামপুষ্ট জাতীয়তাবাদের প্রতিভূ? সার্বিক স্তরে?

স্বাধীনতা জাতীয় জীবনে মৌল পরিবর্তন। কিন্তু কোন্ স্তরে? বহির্পরিবেশে অন্তর-পরিবেশে, না দু-স্তরেই?

কিন্তু এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অমীমাংসিত। তার চাকরীর ক্ষেত্রে এই অমীমাংসিত পরিস্থিতির প্রতিবিম্ব রয়েছে। সে একজন বিপ্লবী সন্দেহ করা সত্ত্বেও "দ্যা এরিনা" কাগজের বড় কর্তা তাকে বরখাস্ত করেন নি। পরিস্থিতি কোন্ দিকে মোড় ঘুরবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তাই উনিও তাকে বরখাস্ত করতে সাহস পাননি।

কিন্তু সাহস জন্মাতে কতক্ষণ? দেশ স্বাধীন, শাসন ব্যবস্থা জাতির হাতে, কিন্তু শাসন-শক্তির উৎস অমীমাংসা-আবছা। পরিস্থিতি বিভ্রান্তিগ্রস্থ। এতে লাভবান হবেন তাঁরাই যাঁদের হাতে আছে বুদ্ধি-শক্তি, শিক্ষা-শক্তি এবং সম্পত্তি-শক্তি। এঁদেরই একাংশের দখলে রয়েছে শাসন ব্যবস্থা আর একাংশের দখলে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব। যে নেতারা মুখে বিপ্লববাদ আওড়ান তাঁদেরও শতকরা নিরানব্বই জন এই শ্রেণীভুক্ত। সরাসরি কিম্বা জ্ঞাতিত্ব বন্ধনে। এঁদের বাবা, মামা, মেসো, পিসে হয় জমিদার, শিল্পপতি, বণিক বীর, কিম্বা উচ্চ আয়ের পেষাদার বা চাকুরে। নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থকে জনস্বার্থ বলে মনে করতে এঁরা বাধ্য। সচেতন মনে না হোক অচেতন মনে। শ্রেণী বিভক্তির রাজনৈতিক ভূমিকা সম্বন্ধে মনীষীরা যা বলে গেছেন তা যদি সত্য হয়। অন্যেরা সবাই বেইমান, ষড়যন্ত্রকারী, ধোঁকাবাজ, পরদেশনির্ভর আর নিজেরা অবিসংবাদিত দেশহিতৈষী কিম্বা যুগ-প্রতিনিধি, এটাই হলো এঁদের মৌল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। তাইতো এঁদের যে সব অংশ নিজেদের নির্ভেজাল

বিপ্লববাদের একচেটিয়া আড়তদারের ভাব মূর্তি নিয়েছেন তাঁদের ফতোয়া হলো, "দেশ স্বাধীনই হয়নি। শাসনযন্ত্র যাদের হাতে দেওয়া হয়েছে তারা গায়ের রং পালটানো ইংরেজ। আমরা যে কয়জন জনবন্ধু আছি তাদের অনুমোদন ধন্য প্রতিনিধিরা যতক্ষণ দেশের একছত্র রাজা না হচ্ছে ততক্ষণ দেশ স্বাধীন হতে পারে কখনো?" সোজা যুক্তি। যেন একশো বছর ব্যাপি মুক্তিসংগ্রামের ফলে জনচেতনা রণপুষ্ট হয়নি, রণ-দুর্বল হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের যে সংগ্রামলব্ধ অংশটুকু আছে, তা অপব্যবহৃত না হয়ে পারে? অর্থাৎ বিপ্লববাদীদের কৃপায় জনশিবির কি আজ আত্মবিভ্রান্তি পর্যুদস্ত নয়? আর এই ফাঁকে যারা গুছিয়ে নেবার সুযোগ পাচ্ছে তারা কারা, সেটা বোঝা কি কঠিন?

প্রবীর অচিরেই বেকার হয়ে যায়। কিন্তু সে অন্য কোন কাগজে চাকরীর চেষ্টা করে না। প্রকাশকের কাছে ছেড়ে রাখা প্রথম উপন্যাসটার কি হয় না হয় সে জন্যেও অপেক্ষা করে না। নতুন একটা উপন্যাস লিখে সেটা নিজের খরচে ছাপিয়ে ফেলে। সে পদক্ষেপটা যে কত বিচক্ষণতা-আশ্রিত ছিল, তাও প্রমাণিত হয়ে যায়। বইটা বেরনোর আগেই প্রকাশকের কাছে দিয়ে রাখা প্রথম লেখা উপন্যাসটা অননুমোদিত হয়ে ফেরত আসে।

॥ তিন

উপন্যাসটা বেরনোর দু-এক দিন পরই প্রবীরের সঙ্গে দেখা করতে আসে প্রভা। দুজনেরই ব্যক্তিগত সমস্যাপুঞ্জ ক্রমেই কঠিনতর হয়ে উঠতে থাকায় তাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ কমে যেতে আরম্ভ করছিল। কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব হয়ে উঠছিল আরো সান্নিধ্য-আশ্রিত। চিঠিপত্রের মাধ্যমে।

আমার বইটা কেমন লাগলো? প্রভাকে প্রবীর জিজ্ঞেস করে প্রথমেই।

ভাল। নতুন স্বাদের উপন্যাস। ভাষা, ভঙ্গী, বিষয়বস্তু সবই চমৎকার। কিন্তু যে কথাটা পাঠককে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হতে যাচ্ছে ভাবছিলাম, সেটাই কিন্তু তুমি এড়িয়ে গেছ। কেন?

সেটা কি না জানা পর্যন্ত কি জবাব দেব, বল?

তুমি যা লিখেছ তা হলো আমাদের জাতীয় সংগ্রামের একটা ভাবগর্ভ পার্শ্বচিত্র। কিন্তু এতে অবয়ব ফুটেছে, ফোটেনি প্রাণ।

কি রকম?

তুমি বিপ্লবী নও, বিপ্লব-পূজারী। তোমার বই-এর মতেও আমাদের জাতীয় সংগ্রাম একটা নতুন স্তরের সমাজ-বিপ্লব। কিন্তু এই নতুনত্বের মূলে কি সেটাই তোমার উপন্যাসে নেই।

কি বলছ? আমাদের জাতীয় সংগ্রামে যা কিছু নতুন তার সারবস্তু ওতে নেই?

আছে, কিন্তু আমাদের জাতীয় সংগ্রামে যা নতুন তা যা-কিছু জাতীয় নয়। মৌলিক। তুমি শুধু বলেছ যে, বিপ্লব-চিন্তায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুগ এসেছে। বলতে ভুলে গেছ যে, ভারতের জাতীয় সংগ্রামে এই যুগ-বার্তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। স্তরে স্তরে, এই সংগ্রামের শুরু থেকে।

কথাটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

মানুষ ধরাকে এমন ভাবে সৃষ্টি-সমৃদ্ধ করেছে যা তার নিরপেক্ষতায় হতো না। প্রকৃতির নিজস্ব সৃষ্টি-শক্তি সেখানে অকেজো। যথা পরমেশ্বরের কল্পনা-সত্তা। এটা মানুষের সৃষ্টি। তাথেকে সৃষ্ট হয়েছে একটা অধ্যাত্ম-জগৎ। সেটা দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, তবুও আজ বাস্তব। ধর্ম নীতি কাব্য দর্শন সঙ্গীত সাহিত্য প্রভৃতি এই আধ্যাত্মিক জগৎ-প্রেরণার ফলশ্রুতি। বিজ্ঞান এবং সব রকমের নির্মাণ-শৈলীও। মানুষের এই সৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূমিকা স্রেফ এইটুকু যে, তার অভিব্যক্তি-ধর্ম যদি মানুষের সৃষ্টি পর্যন্ত না এগতো তবে এসব কিছুই হতো না। পরমেশ্বর নিজেও একটা নিরর্থক ব্যাপ্তি থেকে যেতেন। মানুষের কাছে সেখানে তিনিও ঋণী।

কিন্তু মানুষ নিজে তার সৃষ্টি সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে শেখেনি এখনো। সেখানে সে এখনো তার পাশবিক আদিমতার কবলেই থেকে গেছে। প্রকৃতির জগতে নিজের জোরে যে টিকে থাকতে না পারে তার বেঁচে থাকার অধিকার নাই। সমাজেও মানুষ জোর-যার-মুল্লুক-তার নীতির যুগে আছে এখনো। এই যেমন আণবিক আবিষ্কারের ব্যাপারটা। এই বৈজ্ঞানিক বিজয়ের তুলনা হয় না। কিন্তু তার প্রথম ফলশ্রুতি হিরোসিমা এবং নাগাসাকী! এতো বড় একটা সৃজন-শক্তি ধ্বংস শক্তিতে পরিণত! চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে। যখনো রোগে ক্ষুধায়, অজ্ঞতায় মানব জাতির বৃহত্তম অংশ পশুতুল্য জীবনযাপন করছে। অথচ

সভ্যতাকে এগিয়ে যেতে দেয় এই বিশাল মানবাংশেরই শ্রম-শক্তি।

এর মূলে তো রয়েছে শোষণবাদ-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা।

অংশত। সভ্যতার আত্ম-বিকশন দ্বৈতুরিক। বাস্তবিক এবং মানসিক। বাস্তবিক জগতে উন্নতি ঘটায় উৎপাদন উপায়ের আবর্তন-বিবর্তন। এ-স্তরে শ্রেণী সংগ্রামের ভূমিকা মুখ্য। কিন্তু মনোজগতে আবর্তন-বিবর্তন ঘটায় স্থায়িত্বধর্মী প্রবৃত্তি-গুচ্ছ। এখানে যার ভূমিকা মুখ্য সেটা জন-জাগরণজনিত আত্ম-সংগ্রাম। গোড়ায় এর প্রেরণা উৎস ছিল ধর্ম, এখন বিপ্লব বাসনা। মানুষের শ্রেণী যাই হোক, মূলতঃ সে মানুষ। সর্বত্র এবং সর্বপরিবেশে। ক্ষুধা পেলে সবাইকেই খেতে হয়। যৌবনে সবাই প্রজনন ব্যগ্র হয়ে ওঠে। হাতে ক্ষমতা এলে সেটাকে কাজে লাগিয়ে ঐহিক-সুখ পেতে সবারই ইচ্ছে হয়। যা ভাল সেটা নিজস্ব করার বাসনা সবার মনেই জাগে। ইত্যাদি। কিন্তু বিপ্লব-পরিকল্পনায় এই ব্যক্তি-বৈচিত্র্যগুলো কোন গণনা-সামগ্রী নয়। এটা অপরিহার্য বলে ধরে নেওয়া হয় যে, সমাজ-ব্যবস্থা পাল্টে গেলেই মনোজগতের ভূমিকা পাল্টে যাবে। কিন্তু ইতিহাস কি এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করে দেয়নি? আজ দুটো সমাজ-ব্যবস্থা পাশাপাশি বিরাজমান। কিন্তু স্থায়িত্ব ধর্মী প্রবৃত্তি গুচ্ছের কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কি? অথচ দুটোরই উৎপত্তি-কারণ বিপ্লব। একটা থেকে জন্মেছে পুঁজিবাদ-ভিত্তিক সমাজ, অন্যটা থেকে সাম্যবাদী জগৎ।

এ সব কথা বলে তুমি প্রমাণ করতে চাচ্ছ কি?

দেখাতে চাচ্ছি যে আমাদের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে কোন জিনিষটা নতুন সেটা তুমি দেখনি, বোঝনি। ঔপন্যাসিকের অনুভূতি দিয়ে কল্পনা করেছ।

প্রবীর যেন ধাঁধায় পড়ে যায়। বলে, সে জিনিষটা কি?

আমাদের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে গান্ধীজীর ভূমিকা। তুমি তাঁর অনেক প্রশস্তি গেয়েছ। তিনি নবযুগের যীশু ইত্যাদি বলেছ। কিন্তু তাঁর ভূমিকাটা বিশ্লেষণ করনি।

তুমি করেছ?

না, সে ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে ভাবছি। সম্রাট অশোক এক মহাযুদ্ধ জয় করে নিরস্ত্রতাবাদ গ্রহণ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী নিরস্ত্রতাবাদ গ্রহণ করে আমাদের জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামের প্রধান নেতা হয়েছিলেন। এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে যা পার্থক্য সেটা শুধু এই নয় যে একজন ছিলেন রাজা, অন্যজন গণ-নায়ক। সম্রাট অশোকের জন্মদাতা ছিল অনড়

উৎপাদন-উপায় এবং স্থায়িত্ববন্দী উৎপাদন ব্যবস্থা। গান্ধীজীর রাজনৈতিক জন্মদাতা এদেশের অঙ্কুরায়িত শিল্পবিপ্লব এবং পুঁজিবাদ। এখন বল, যা আমি বললাম তার কোন তাৎপর্য আছে ?

এখনো বলতে পারব না, ভাবতে হবে।

তবে আরো শোন। তুমি তোমার বই-য়ে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের চিত্রটা যে দিক থেকে তুলে ধরেছ তার সার্থকতা যথেষ্ট। কিন্তু আসল ব্যাপারটা থেকে গেছে ধোঁয়াটে। খানিকটা নয়, অনেকটা। মানুষ এগিয়ে যায় দুস্তরে লড়ে লড়ে। নিজের সঙ্গে, এবং নিজেদের মধ্যে। অর্থাৎ দ্বিপদ সভ্যতার এক পা আত্ম-সংগ্রাম, অন্য পা শ্রেণী-সংগ্রাম। কিন্তু সভ্যতার জন্মশর্ত হলো বাস্তব জগৎ এবং চিন্তা-জগতের মধ্যে যে দেওয়া-নেওয়ার চিরন্তনী সম্বন্ধ আছে, তা থেকে। এই দেয়া-নেয়ার সম্পর্কটা যেদিন একটা নির্ভেজাল ক্রিয়া শর্ত থেকে একটা জটিলতা আশ্রিত শ্রেণীসংগ্রাম-শর্তে পরিণত হয়েছিল, সেদিনটাই ছিল সভ্যতার জন্মদিন। কিন্তু মানুষের মধ্যে দেয়া-নেয়ার সম্বন্ধটা একটা ক্রিয়াশর্ত থেকে জটিলতা-আশ্রিত শ্রেণীসংগ্রাম শর্তে পরিণত হওয়াতে ও রিপু নামক যে ছ-ছটা জীবন-তাড়না আছে তাদের চরিত্র যেমন ছিল তেমনি থেকে গেছে, এবং থাকবেও। যা পাল্টেছে, এবং আরো পাল্টাবে, তা আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারা এবং ভূমিকা। সেটা-ই আবার পাল্টানোর সময় এসেছে। ভারতের জাতীয় সংগ্রামের গূঢ়ত্ব এখানেই। আজ সমাজ পাল্টালেই চলবে না। মানুষের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি এবং ভূমিকা পাল্টাতে হবে। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক স্তরে যুগপৎ বিপ্লব ঘটাতে হবে। গান্ধীজীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এখানেই। ভারতের জাতীয় সংগ্রামেরও। গান্ধীজীর অভ্যুত্থান অন্য কোন দেশে না হয়ে ভারতে হওয়ারও একটা আলাদা তাৎপর্য আছে। এখানে সভ্যতা এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পেয়েছে যার ফলে জাতীয় জীবন সংশ্লেষণ-প্রাণ হয়ে গেছে। থিংস গেট সিন্থেসাইজড হিয়ার। শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে আত্ম-সংগ্রামকে সম্পৃক্ত করা এখানে সম্ভব। সেটাই হবে নব-যুগের বিপ্লব। গান্ধীজীর উদ্ভাবিত সত্যাগ্রহ সমর-নীতিতে তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

মার্কসের একটা যুগ ঝাঁকানো উক্তি হলো, ফোরস্ ইজ দ্যা মিডওয়াইফ অব রিভলিউশন। কিন্তু আজ এই ধাত্রীর আঙুলে আণবিক নখ গজিয়েছে। তার মানে এই নয় যে বল-প্রয়োগ ছাড়াই সমাজ বিপ্লব সম্ভাব্য হয়ে উঠেছে। বল-প্রয়োগের চরিত্র পাল্টাতে হবে। সত্যাগ্রহ বল-প্রয়োগের চারিত্রিক বিপ্লবের সূচনা-বিন্দু। তোমার এই উপন্যাসটা যুগ-ঝাঁকানো হতো যদি তুমি এই সমর-

নীতি এবং সমর-কৌশল কিভাবে প্রয়োগ সমৃদ্ধ হয়েছে সেটা দেখাতে পারতে।

কমিউনিষ্ট স্থাপিত নতুন সমাজ দেখে একটা কথা কেউ আজ অস্বীকার করতে পারে না। মানব জাতিকে শাসক এবং শাসিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকতে হবে আরো অনেক দিন। হয়ত চিরকালই। যদি মানুষ ইতিহাসের গতি পাল্টানোর সঙ্গে নিজেকেও পরিবর্তিত করতে না পারে। রাজারাও সাধারণ মানুষ। আছেন, থাকবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, ইত্যাদি রিপুগুলোর বিচারে তাঁদের আর সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন তফাৎ নাই। গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ভূমিকা এখানেই। তিনি সাধারণত্বের ভিত্তিতে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে শাসন ব্যবস্থার স্তরে কল্যাণকর সমদায়িত্ব সৃষ্টি করার পথ দেখিয়ে গেছেন।

স্বাধীনতার পর গান্ধীজী যা ইচ্ছে হতে পারতেন। রাজা হতে চাইলেও। কিন্তু স্বাধীন ভারতে তাঁর ভূমিকা কি হয়ে উঠেছিল ? সত্যাগ্রহ নীতি-আশ্রিত প্রতিপক্ষবাদ। কিন্তু সত্যাগ্রহ নীতি ? সেটা কি ? সেটা হলো, শক্তি-প্রয়োগে মানবিকতার ভূমিকা সৃষ্টি করার "থিয়রি অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস"।

॥ চার ॥

প্রভা এবং প্রবীরের মধ্যে এই আলোচনা চলতে থাকে কয়েকদিন ধরে। মতভেদ হেতু নয়। বিষয়টা তলিয়ে দেখার আগ্রহে। তত্ত্ব এবং তথ্যের আলোকে ব্যাপারটাকে সমীক্ষণ সবল করার চেষ্টায়। দুজনের মধ্যে আবার ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ হবার তাগিদ জাগে। ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো তাতে পাশকাটা হয়ে থাকে না। দেখা হলেই তারা মূল আলোচনাতেও যেতে চায় না। সাহচর্য-সুখ উপভোগ করে। হাসি-ঠাট্টা এবং গল্প-গুজবে অনেক সময় কেটে যেতে দেওয়া হয়। অনেক উপলক্ষে সেই গুরু-গম্ভীর আলোচ্য বিষয়টাই পাশ-কাটা হয়ে থাকে। কোন কোন দিন দুজনে মিলে সিনেমা-টিনেমাও দেখতে চলে যায়। যা তারা আগে কখনো করতো না। একদিন প্রবীর বলে, তোমার সেই গোপন ব্যথাটা কি আমাকে কিন্তু আজো বলা হয়নি, প্রভা। এটা ইচ্ছাকৃত না দৈবক্রমে ?

ইচ্ছাকৃতও না দৈবক্রমেও না। আমার মনে হচ্ছে, ব্যথাটা কি সেটা আমি

জানিই না। হয়তো সবটাই একটা কল্পনা-বিকার।

কল্পনা-বিকারই হোক বা যাই হোক্‌, ব্যাপারটা আমি শুনতে চাই। বলতে আপত্তিটা কি?

আপত্তি নেই কিছুই, আছে মুশকিল। এর কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ তাই আমি বুঝি না।

যা বোঝ তাই বল।

কিন্তু শুনে যদি কোন অর্থ খুঁজে না পাও?

শুনি তো আগে।

অর্থাৎ আমাকে দিয়ে কথাটা বলাবেই।

প্রভা যখন ক্লাস থ্রি কিম্বা ফোরে পড়ছিল তখন লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। সারা দেশে আন্দোলন। তাদের শহরেও। একদিন সে এমন একটা মিছিলের সঙ্গে ভিড়ে যায় যেটার ওপর পুলিশে লাঠি আক্রমণ চালায়। প্রভার সঙ্গে তার সমবয়সী আরো কয়েকজন ছিল। লাঠি উঁচিয়ে পুলিশকে তেড়ে আসতে দেখে ওরা সবাই পালিয়ে যায়। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু যে কয়জন মিছিলকারী লাঠির ভয়ে পালায় না তাদের একজন ছিল প্রভা। সে-ও ভয় খেয়ে যায়। দারুণ। কিন্তু জেদ ছিল তার মুখ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পুলিশকে তেড়ে আসতে দেখেও কয়েকজনকে ঠায় দাঁড়াতে দেখে সে-ও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, ঋজুগ্রীবায়। আরো যে কয়েকজন দাঁড়িয়ে থেকে গিয়েছিল তাদের সারিতে। লাঠি আক্রমণরত পুলিশের সাধারণ বিচার বিবেচনা থাকে না। মারধোর খেয়েও ভেগে যায়নি মানুষদের সঙ্গে প্রভার ওপরও একটা লাঠির খোঁচা পড়ে। কিন্তু সে না পালিয়ে মাটীতে পড়ে ধড়ফড় করতে থাকে। চেঁচাতে চেঁচাতে। পুলিশ তাকে তাদের ভ্যানে তুলে নেয়।

সে কে, পুলিশ তখনো চিনতে পারে না। কিন্তু মহল্লার লোকেরা পারে। জাগে উত্তেজনা। কিছু লোক পুলিশের দিকে ইঁট পাটকেল ছুঁড়তে আরম্ভ করে। বাধে সংঘর্ষ। ছোটখাটো। কিন্তু দুপক্ষেই কিছু মানুষ জখম-টখম হয়। আর এই রক্ত-নাট্যের নায়িকা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে প্রভা। তার জন্ম শহর রাজকোটেই নয় কেবল, বোম্বের পত্র-পত্রিকাতেও এই ঘটনার বিবরণ ছাপা হয় এবং তাতে তার ছবিও থাকে।

প্রভার বাবা ইন্দুলাল শাহ রাজকোটের এক বিরাট ব্যবসায়ী। কিন্তু তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং সেকেলে। ঐ যুগের কাচ্ছি বেনেদের আরো অনেকের

মতো। মেয়ের এই প্রসিদ্ধিতে তিনি যে সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকেন তা নয়। আনন্দে কিম্বা স্বদেশীয়ানায় উছলেও পড়েন না তিনি। বরং মেয়েদের স্কুলে পাঠালে তার পরিণাম কি হয় সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি স্ত্রী সুভদ্রা-বেনকে খোঁচা দিয়ে কথাটথা শোনান।

কাচ্ছি বেনেরা লক্ষীর পূজারী। সে যুগে সরস্বতীকে বিশেষ আমল দিতেন না। মেয়েদের দূরে থাক, ছেলেদেরও স্কুলে পাঠানোর তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা তাঁরা দেখতেন না। কিন্তু গুজরাট মহাত্মা গান্ধীর জন্মপ্রদেশ, কচ্ছ তাঁর জন্ম-এলাকা। গান্ধী যুগের হাওয়ায় অনেক পুরণো দস্তুর এবং রীতিনীতি ধসে পড়ছিল। সারাদেশে তো বটেই, কচ্ছেও। সুভদ্রাবেনের কথায় ইন্দুলালও প্রভাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ রক্ত-নাটিকাটি ঘটার অল্প কয়েকদিন পর থেকে তিনি প্রভার স্কুলে যাওয়া থামিয়ে দেন। প্রভা সেটা মেনে নিতে পারে না। শিক্ষার কি মাহাত্ম্য সে তখনো বুঝতো না। কিন্তু মেয়ে হয়েও স্কুলে পড়তে যাওয়ার নব্যতাটা তার ভাল লাগছিল। তার মধ্যে জাগিয়েছিল একটা রোমাঞ্চ তাড়নাও। সে কাঁদাকাটি করে তার মাকে অতিষ্ট করে তোলে। লবণ সত্যাগ্রহে প্রসিদ্ধি লাভ করা মেয়ে সে। ব্যাপারটা শহরেও একটা সমালোচনা-বহ প্রতিক্রিয়া জাগায়। কয়েকজন গণ্যমান্য প্রতিবেশীর পরামর্শে ইন্দুলাল তাকে আবার স্কুলে পাঠান।

কিন্তু তার বয়েস চৌদ্দ বছর হওয়ার অপেক্ষায়। ঐ অঞ্চলের প্রথা অনুযায়ী তার আগেই প্রভার বিয়ে হয়ে যেতো। সারদা আইনের বেড়া ডিঙ্গিয়ে। কিন্তু তার ক্ষেত্রে বয়েস লুকোনো সহজ ছিল না। তাই কানুন নির্দেশিত সময় সীমা পার হওয়া মাত্রই ইন্দুলাল তার বিয়ে ঠিক করে ফেলেন।

প্রভা বেঁকে বসে। শিক্ষার মাহাত্ম্য তখনো সে তত বোঝে না। কিন্তু নিজের মনে যে ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন ইতিমধ্যে জেগে গিয়েছিল তাতে শিক্ষার স্থান ছিল মুখ্য। যুগধর্মের ইশারায়। কৈশোর বিবাহ সম্পর্কেও তার মনে একটা বিরুদ্ধতা-প্রভাবিত মতবাদ দানা বেঁধে উঠছিল। কিন্তু এবার সে নিঃসহায়। তার মা তাকে আস্কারা দেন না, গালাগাল করেন, সে বয়ে যাচ্ছে ভেবে তার তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্যে স্বামী ইন্দুলালের চেয়েও ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। জনমতও এবার তার বিপক্ষে যায়। উপযুক্ত বয়েসে মেয়ের বিয়ে দেওয়া পিতার কর্তব্য। পিতৃকর্তব্য পালনে বাধা দিতে পারে মেয়েকে কেউই ভাল বলে না। মরীয়া হয়ে প্রভা এক চাঞ্চল্যকর কাজ করে বসে। সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেয়ে

আশ্রয়প্রার্থী হয় স্থানীয় রাজনৈতিকদের মধ্যে যিনি খুব প্রবীণ ছিলেন এবং যাঁকে চরম গান্ধীবাদী মনে করা হতো, তাঁর কাছে। ইনি পড়েন মহা মুশকিলে। একটি মেয়েকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে দেওয়ায় সাহায্য করা এবং না করা দুটোই অনুচিৎ মনে হয়। দেশাচার অনুসারে উপযুক্ত বয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়া পিতার কর্তব্য। অল্প বয়েসে মেয়েদের বিয়ে হতে দেওয়া যুগধর্মের খেলাপ। প্রভা আবার লবণ-সত্যাগ্রহে ছিল।

অনেক ভেবে চিন্তে গান্ধীবাদী প্রবীণ নেতাটি প্রভাকে আশ্রয় দেন, এবং সে খবর তার বাবার কাছে অবিলম্বে পৌঁছিয়ে দিয়ে যা করা হয়ে গেছে তার পরবর্তী পরিণতির অপেক্ষা করতে থাকেন।

তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় সামান্য সময়ই। ইন্দুভাই ছুটে আসেন মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যেতে। নেতাটি প্রভাকে ডেকে এনে তাকে তার বাবার সাক্ষাতে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন। এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই হবে। যদি বাড়ি ফিরে যেতে চাও যাও, না যেতে চাও থাক। আমার আশ্রয় থেকে জোর করে তোমাকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না।

প্রভা থেকে যায়।

কিন্তু প্রভা নাবালিকা। তাকে আশ্রয় দেওয়া বে-আইনী কাজ। ইন্দুলাল সে কথা প্রবীণ নেতাকে জানান। স-আস্ফালনে। নেতাটি শুধু বলেন, দেখা যাক। ইন্দুলাল পুলিসের সাহায্য চাইতে যান।

নেতাটিও হাত গুটিয়ে বসে থাকেন না। শহরের সর্বস্তরের রাজনৈতিক মহলে এ সম্বন্ধে এত্তেলা দেন। বসে মিটিং। সবদিক বিবেচনা করে প্রভাকেই সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এ পক্ষেরও এক প্রতিনিধিদল এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার খবরটা পুলিসকে গিয়ে জানিয়ে আসে। সবিনয়ে এবং স-যুক্তিতে একথাও জানিয়ে দেয়া হয় যে, সরকার পক্ষ যদি আইনের জোরে প্রভার ইচ্ছাকে নাকচ করতে যান তবে তাতে বাধা দেওয়া হবে। সত্যাগ্রহ নীতি অনুযায়ী। সেজন্যে যে প্রস্তুতিও হয়ে গেছে তাও বলে দেওয়া হয়। পুলিস যদি প্রভাকে জোর করে নিয়ে যেতে আসে, তবে দু-দুজন করে ভলেণ্টিয়ার তাদের পথ রুখে দাঁড়াবে।

বিরোধী পক্ষের এই ধমকটা সরকার পক্ষ তেমন আমল দেন না। সমস্যাটা সামাজিক। ধর্ম এবং দেশাচার এতে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। নেতারা মুখে যাই বলুন, মনে মনে তাঁরাও পুলিস-ক্রিয়ার সমর্থক। জনমত কোন্‌দিকে সে সম্বন্ধেও

সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে করা হয় না। চিরাচরিত বৈবাহিক নীতি-নিয়ম ভাঙ্গবার পক্ষে কেউ দাঁড়াবে না।

আইনের জোরে পুলিস প্রভাকে নিতে আসে। ঘটে এক তাজ্জব-জনক পরিস্থিতি। দলে দলে মানুষ এসে গান্ধীবাদী নেতার বাড়ির কাছে জড় হতে থাকে এবং দু-দুজন করে সত্যাগ্রহী পুলিশের রাস্তা আটকে দাঁড়াতে যায়। পঁচিশ-ত্রিশ জন মানুষ গ্রেপ্তার হয়ে যায় অল্পক্ষণের মধ্যেই। তাদের প্রায় সবাই যুবক এবং নানা বয়সের মেয়েরা।

ঘটনার ঝাঁকানিটা শহরের উচ্চতম মহল পর্যন্ত অনুভূত হয়, শহরে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে, সত্যাগ্রহের সমর্থকরা এদিকে দলে ভারি হতে থাকে। তাই মুরুব্বিদের উদ্যোগে আবার মিটিং বসে। তাতে ইন্দুলালকে হার মানতে হয়। প্রভাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে না দিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হতে হয় তাঁকে। সর্বসমক্ষে।

তবে পারিবারিক জীবনে পিতার ক্ষমতাটা কি, সেটাও না জাহির করে ছাড়েন না তিনি। প্রভাকে বাড়ি ফিরে যেতে দেওয়া হয় না। তাকে আশ্রয় নিতে হয় এক আশ্রমে। রাজকোটেই নয়, আমেদাবাদে। তবে ইন্দুলালকে এবারও খানিকটা পিছপা হতে হয়। আত্মীয়-স্বজনের চাপে প্রভাকে একটা মাসোহারা ধার্য করে দিতে হয়। সে সুযোগে সে আবার হয় পাঠরতা।

কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে তার সংস্পর্শ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আই-এ ক্লাসে পড়বার সময় কিছুদিনের জন্যে তাকে জেলও খাটতে হয়। সুরেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে কারামুক্তির পর তার সম্মানে দেওয়া এক অভিনন্দন সভায়। তার সাহস প্রসিদ্ধি কার্যতৎপরতা এবং উদ্যোগপ্রবণতা দেখে তাকে দলে টেনে আনার চেষ্টা হচ্ছিল নানা তরফ থেকে। সুরেশ যে দলের সদস্য ছিল সেটার দিক থেকেই বেশী। অভিনন্দন সভাও তারাই ডেকেছিল। সুরেশের প্রভাবে সে দলেই সে শেষ পর্যন্ত যোগদান করে। তারা দুজনের বাক-বন্দি প্রেমিক-প্রেমিকা হবারও সেটাই পৃষ্ঠপট।

প্রভার বর্ণনা সমাপ্ত। দুজনেই চুপ। কিন্তু পলার্ধের জন্যে। প্রবীর বলে, যা তুমি আমাকে শোনালে তা আমার কাছে তাৎপর্যহীন মনে হবে বলে কেন ভেবেছিলে বুঝতে পারছি না। কি সংগ্রাম-সঙ্কুল জীবন তোমার!

প্রভা হাসে। তুমি কিন্তু আসল কথাটা ভুলে যাচ্ছ প্রবীর। যা আমি বললাম তা আমার আত্মচরিত। সেই বুক-ভাঙ্গা ব্যথাটা কি, বলা

হয়েছে কি?

প্রবীর অপ্রস্তুত হয় না। বলে, সেটা অনুমান করার মতো সামগ্রী পেয়েছি।

কি?

বলব না, স্মৃতি-সম্পদ করে রাখব।

বলবে না কেন?

যে কারণে তুমি এ-কথা আমাকে বলতে চাওনি।

প্রভা আর কিছু বলে না। হঠাৎ সে প্রবীরকে টেনে ধরে একটা চুমু খায়। ঠোঁটে। তার পর মুখ ঘুরিয়ে একটু কাঁদে। নীরবে।

এর কয়েক দিন পরে প্রবীর শুনতে পায় প্রভা দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে গেছে।

পাঁচ ॥

প্রভা দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যাবার মাস কয়েক পর একদিন সকালে পত্রিকা হাতে নিয়েই প্রবীর আঁৎকে ওঠে। প্রথম পৃষ্ঠার এক ধার থেকে অন্য ধার পর্যন্ত ছড়ানো হাতে বসানো বড় বড় অক্ষরে ছাপা প্রধান সংবাদের শিরোনামাটা পড়ে: নাসিক জেলে রাজনৈতিক দাঙ্গা: পাঁচজন নিহত, দশজন গুরুতর আহত: নিহতদের একজন এবং আহতদের দুজন পুলিস।

খবরটার ভয়ঙ্করত্বই প্রবীরের আঁৎকে ওঠার একমাত্র কারণ ছিল না। নাসিক জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের একজন ছিল সুরেশ পেটেল।

রুদ্ধশ্বাসে প্রবীর নিহতদের নামগুলো পড়ে ফেলে প্রথম। না, সুরেশের নাম ওতে নেই। নিষ্কৃতি-সুখে এবার সে আহতদের নাম তালিকাটা দেখে। না, ওতেও ওর নাম নেই।

সুরেশের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে প্রবীর জেল-দাঙ্গার খবরটা পুরোপুরি পড়ে। ব্যাপার মোটামুটি এই:

আগের দিন বিকেলে জেল আঙ্গিনায় ভ্রমণ-ছুটীর অন্তে সেলে যাবার ঘন্টি বাজানো হলে রাজবন্দীরা সেটা অমান্য করে। বৈকালিক বিচরণ-সময়ের

অপ্রতুলতা সম্বন্ধে অভিযোগ তোলে। দেখতে দেখতে কথা কাটাকাটি, ঘুষোঘুষি, ধাক্কাধাক্কি। বাজে সঙ্কট-ঘন্টী। ছুটে আসে প্রহরী পক্ষের সশস্ত্র অংশ। বুলেটের সঙ্গে বিনিময় হয় শুধু ইট-পাটকেল নয়, সোডার বোতল এবং এসিড্ বালব্। হতাহতের সংখ্যাধিক্য ঘটে।

প্রবীর বসে বসে ভাবতে থাকে। নাসিকের জেল-দাঙ্গা একটা আকস্মিক অপ-ঘটনা ছিল না। দেশের নানা স্থানে কয়েদখানায় দাঙ্গা হচ্ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে হতাহতের সখ্যা আতঙ্কজনক হচ্ছিল। ব্যাপারটা কি, প্রবীর জানতো কিন্তু বুঝতে পারছিল না। যা হচ্ছিল সে জন্যে দায়ী ছিল পুলিস-ক্রিয়া নয়। সুরেশদের দলই তাদের আন্দোলন-পদ্ধতি আমূল পরিবর্তন করে ওসব ঘটাচ্ছিল। প্রবীর সেটা একটুও অনুমোদন করেনি।

নাসিক জেল-দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে সুরেশের কথা ভাবতে ভাবতে প্রবীরের মনে পড়ে যায় প্রভাকেও। ওর আর এক মাসি দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক। তাঁর ডাকেই ও সেখানে গেছে। শোনা যায় এই বিদেশ বাসের ব্যবস্থা প্রভার মা করিয়েছেন। মেয়েটা এদ্দিন যাবত বিয়ে না করে থেকে গেছে দেখে তিনি ভীষণ উৎকন্ঠিত। তাই ওকে বিদেশে পাঠিয়েছেন। ভৌগলিক দূরত্ব ঘটিয়ে ওর আর সুরেশের মধ্যে মানসিক ব্যবধান জাগানোর, অভিসন্দিতে।

নটা বেজে গিয়েছিল। প্রবীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাস-স্টপে লম্বা লাইন। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আবার ভাবতে থাকে নাসিক জেল-দাঙ্গার কথা। পুলিসের তরফে ওটা ঠাণ্ডা মাথায় ঘটানো একটা হত্যালীলা, এই অভিযোগে শহরের কয়েকটা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কিছু সংখ্যক নির্দলীয় গণ-নেতা একটা প্রতিবাদ-বিবৃতির মাধ্যমে সেদিন সার্বিক হরতালের আহ্বান দিয়েছেন। এই হরতাল সূচীও সে অনুমোদন করতে পারে নি। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ এতে ক্ষুণ্ণ হবে বলে তার দৃঢ় ধারণা।

ঐ যুগে স্ট্রাইক ইত্যাদি উপলক্ষে বৃহত্তর বোম্বের যে কয়টি এলাকায় দৈনন্দিন জীবন প্রায় অব্যাহত থাকতো থার তাদের একটি ছিল। কিন্তু ওখানকার যে-কোন বাস-স্টপে দাঁড়ালে নাগরিক প্রতিক্রিয়াটা আঁচ করা যেতে পারতো। মহল্লার অধিবাসীদের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। শিক্ষিত। দেশে কিম্বা শহরে চাঞ্চল্যকর কোন ঘটনা হলে তা নিয়ে কিউয়ে দাঁড়ানো মানুষদের মধ্যে কথাবার্তা হতে শোনা যেতো। কিন্তু সেদিন নাসিক জেল-দাঙ্গা এবং তার প্রতিবাদে ডাকা হরতাল নিয়ে কাউকে উত্তেজিত হতে দেখা যায় না। "আবার

একটা জেল-দাঙ্গা হয়ে গেল। কি যে সব হচ্ছে ?" "আজো একটা হরতাল ডাকা হয়েছে। কিন্তু বাস-টাস তো চলছে যথারীতিই দেখছি।" এই ধরণের কিছু মন্তব্য অবশ্য থেকে শোনা যাচ্ছিল। প্রবীর তা থেকে কোন স্পষ্ট ধারণা করতে পারে না।

ইতিমধ্যে শহরমুখো যে দু-তিনটে বাস চলে যায় তাতে ছিল উপচে পড়া ভিড়। অন্যান্য দিনের মতোই। তবু প্রবীর ইচ্ছে করলে ও-সবের কোন একটা ধরে যেতে পারতো। কিন্তু সে চেষ্টা করেনি। বাস ধরার ব্যাপারে সে নিরুদ্বিগ্ন। তার সময়ের তাড়া নাই। সে বেকার। সে অপেক্ষা করে এমন একটা রুটের বাসের জন্যে যেটা শহরের বুক চিরে যায়। হরতাল কতখানি সফল হচ্ছে দেখার জন্যে এবং ও-সবেরই একটাতে সে চড়ে। কিন্তু হরতাল লক্ষণ তেমন কিছু চোখে পড়ে না। দোকানপাট সব খোলা, জনজীবন স্বাভাবিক। তার মনে পড়তে থাকে অনতি অতীতের কয়েকটা উপলক্ষ। কুইট ইণ্ডিয়া গণ-উত্থান, আই. এন. এ দিবস, আর. আই. এন. বিদ্রোহ। এইসব অবিস্মরণীয় উপলক্ষে গণ-প্রতিক্রিয়া কতই না ব্যাপক এবং স্বতঃস্ফুর্ত ছিল। প্রত্যেকবার। মনে পড়ে তার গান্ধীজীর হত্যা উপলক্ষে শোক-চঞ্চল বোম্বেবাসীর অস্থৈর্য। আর আজ!

অনতি অতীতের অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলোর সঙ্গে সেদিনের আহুত হরতালের তুলনা করে দেখছিল সে বিশেষ কারণে। এই দলের প্রচার-লিপিগুলোতে যে কথাটার ওপর সর্বাপেক্ষা বেশী জোর দেওয়া হচ্ছিল সেটা হলো এই। ভারতের স্বাধীনতা ভূয়ো। জনতা তা জানে। বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়গুলো। তারা এই ধোঁকাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-ক্ষিপ্ত, বিপ্লব-মন্যতায় অগ্নিকুণ্ড। কিন্তু তারা নিঃসহায়। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তারা ধোঁকাবাজির শিকার হয়ে চলেছে। আজ এই প্রতিবাদ-ক্ষিপ্ত জনতাকে নেতৃত্ব দিতে হবে, ছাই-চাপা বিপ্লব-মন্যতার অগ্নিকুণ্ডে দিতে হবে ঘৃতাহুতি। দল-নেতৃত্বকে শোধিত করতে হবে বিপ্লব-যজ্ঞে। জেল-দাঙ্গা ইত্যাদি এই উপযুক্ত নেতৃত্বের অধিষ্ঠিতি অনুষ্ঠান, বিপ্লব-মন্যতার অগ্নিকুণ্ডে অগ্নিগর্ভ নেতৃত্বের ঘৃতাহুতি।

বাস শহরের মুখ্য কারখানা-কেন্দ্রে। না, এখানেও চমকে ওঠার মতো কোন হরতাল লক্ষণ নাই। দোকান-টোকানগুলোর বেশীর ভাগই খোলা। তবে পুলিশের উপস্থিতি-ব্যাপ্তি অত্যধিক। এখানে সেখানে ইট-পাটকেল এবং সোডা-ওয়াটার বোতলের ভগ্নাংশে সংঘর্ষের সঙ্কেত। কিন্তু সার্বিক আবহাওয়ায়

অগ্নিগর্ভ বিপ্লবমন্ত্রতার কোন ছোঁয়া নেই। প্রাক্-স্বাধীনতা দশকে অনেক উপলক্ষে যেমন থাকতো।

কারখানা-কেন্দ্রে ঢুকেই প্রবীর বাস থেকে নেমে পড়ে। মহল্লাটা যথাসম্ভব ঘুরে দেখতে। এলেকাটা সুবিস্তৃত। মুখ্য শ্রমিক পাড়াগুলো এখানে কেন্দ্রীভূত। যে দল হরতাল ডেকেছিল সেটারও এটাই প্রধান প্রতিপত্তি অঞ্চল। এখানেই শহরের বেশীর ভাগ টেক্সটাইল মিলগুলো কেন্দ্রীভূত। দুটো বড় রেলওয়ে কারখানা এবং ছোট-বড় আরো অনেক কলকারখানা এখানেই। কিন্তু প্রবীর যতই হেঁটে চলে ততই তার মনে হয় হরতালের সাফল্য এখানেও যৎসামান্য। নগর-জীবন এখানেও প্রায় স্বাভাবিক। শুধু সংঘর্ষ সঙ্কেতের সংখ্যাটা ছাড়া। ইট পাটকেল, সোডা-ওয়াটার বটলের ভগ্নাংশ বিক্ষিপ্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল এখানে বেশী সংখ্যক জায়গায়। দু চারটা কলকারখানা বন্ধ কিম্বা আংশিক চালু। একটা গায়ে-পড়া উত্তেজনা উত্তাপও অনুভূতি-গ্রাহ্য। কিন্তু এর ব্যাপ্তি সীমিত, গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক।

প্রবীর না খেয়ে বেরিয়েছিল। ঘন্টা দেড়েক হেঁটে বেড়ানোর পর তার ক্ষুধা পেয়ে যায়। কোথায় খেয়ে নেবে সে ভাবতে থাকে। যা এক সময় "বন্ধ" নামে অভিহিত হতে যাচ্ছিল, তা তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। যে-কোন হরতাল উপলক্ষে একদিনের জন্যে জনজীবন দুর্ভোগ্য করে তোলার প্রবণতা তখনো জন্মায়নি। হরতাল আহ্বানের প্রধান উদ্দেশ্য তখনো ছিল প্রতিবাদ প্রকাশন এবং সমর্থন আহরণ। জোর-যার-মুল্লুক-তার-নীতির অনুসরণে দাপট দর্শানো নয়। হরতালের দিনেও জনসাধারণকে যে খেতে-টেতে হয়, তাদের অধিকাংশই যে সেজন্যে হোটেলে-টোটেলেই আশ্রয় নেয় এবং তাদের জীবিকা যে রোজ-আসা উপার্জনের উপর নির্ভরশীল, একথা ভুলে যাওয়া হতো না। অন্ততঃ সর্ব উপলক্ষেই না। তাই হোটেল-টোটেল খোলা। কিন্তু কোথায় খাওয়া উচিত, প্রবীর ঠিক করতে পারে না। কোন একটা হোটেলে না বাড়ি ফিরে যেয়ে রেঁধে? খরচ বাঁচাতে।

ভাবতে ভাবতে সে এসে পৌঁছয় ঐ এলাকার একটা সুপরিচিত চৌমাথায়। চিন্‌কুচপকলি নামক উপমহল্লায়। জায়গাটার প্রধান আকর্ষণ একটা "বিশ্রান্তি গৃহ", অর্থাৎ হিন্দু হোটেল। সঙ্গে সঙ্গে সে ওখানে খেয়ে নেবে ঠিক করে ফেলে। মজদুর মহল্লায় ডাকসাইটে হোটেলেও খাওয়া সস্তা; দ্বিতীয়তঃ তার মনে হয় বাড়ি ফেরার আগে "ফোর্ট" এলেকাটা অর্থাৎ মুখ্য শহরাঞ্চলটা দেখে যাওয়া

উচিত। কারণ প্রাদেশিক বিধান সভার অধিবেশন চলছিল। সেদিনের অন্তিম কার্যসূচী ছিল ওখানে মিছিল নিয়ে যাওয়া।

তখন দুপুর। হোটেলে গিজগিজে ভিড়। প্রবীর যে টেবিলে স্থান পায় তাতেও। কিন্তু খেতে খেতে সে একটা জিনিষ লক্ষ্য না করে পারে না। গ্রাহকদের মধ্যে হরতাল আলোচনা যৎসামান্য। ঘটনাটা উপেক্ষিত থাকে না। কিন্তু উল্লেখ-উপলক্ষ তেমন স্থায়ী, বাঙ্ময় কিম্বা উত্তেজনাগ্রস্ত মনে হয় না। তবে এখানেই সে প্রথম জানতে পারে যে সেদিন, দু-এক জায়গায় পুলিসের গুলিতে কিছু মানুষ আহত হয়েছে। কিন্তু হরতাল আলোচনায় এ ব্যাপারটা ভেসে ওঠার মুহূর্তেও উত্তেজনা উত্তাপ বিস্ফোরণ মাত্রার আশপাশ ছুঁয় না। গ্রাহকদের শতকরা পঁচানব্বইজনই মজদুর, তবুও। অবশ্য প্রায় সবাই মারাঠী ভাষী। কথ্য স্তরের। কিন্তু তা প্রবীরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। কি বলা হচ্ছিল সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তা থেকে তার যা মনে হচ্ছিল তা এই। নাসিক জেলের হাঙ্গামাটা একটা রাজনৈতিক খেলা। দেখে যাও কে জেতে কে হারে।

প্রবীর পরবর্তী ভ্রমণাংশের জন্যে ট্রেন ধরে। চার্চ গেট স্টেশনে সে যখন নামে তখন বৈকালিক পত্রিকাগুলো ফেরিওয়ালাদের হাতে। ওগুলোর যে তিনটি ইংরেজী ছিল সেগুলোর সবকটাই সে কিনে ফেলে। না, নাসিক জেল-দাঙ্গায় পুলিসের গুলিতে সুরেশ আহত-টাহত হয়নি।

প্রবীরের মনে জাগে এক রাজনৈতিক প্রশ্ন। যে আন্দোলন সমর্থনে এই দাঙ্গা এবং হরতাল, তা দেশের পক্ষে শুভ না অশুভ? সে রাজনীতি করে না। স্বাধীন ভারতে সে বেকার। কিন্তু দেশের স্বার্থ ব্যক্তিগত সংস্রবের ঊর্ধ্বে। তাছাড়া একটা স্তরে তার রাজনৈতিক চিন্তা সিদ্ধান্ত-বন্দি। স্বাধীনতা বাস্তব এবং সেটা জনসংগ্রামের প্রধান বিজয়-নিশান। ফলে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রশক্তির একাংশ জন-কবলিত। এখন প্রশ্ন, যে আন্দোলনে সুরেশের দল নেমেছে, তা কি জনস্বার্থ বিরুদ্ধ নয়? অংশত?

ভাবছিল প্রবীর হাঁটতে হাঁটতে। কিন্তু ফ্লোরা ফাউন্টেনে এসেই সে চমকে ওঠে। পুলিস বন্দোবস্তর কড়াকড়ি খুব বেশী। তখন বেলা চারটে সাড়ে চারটে। ওখানে এ সময় রোজই ক্রমবর্ধিষ্ণু লোকবাহুল্য আসন্ন কার্য সমাপ্তির সঙ্কেতবহ হয়। একটা প্রসন্নতা-তরঙ্গ ও অনুভূতি-গ্রাহ্য হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু সেদিন; ওখানে শহর-জীবন থমথমে। লোকবাহুল্য বেশী, কিন্তু তাদের গতি

যাতায়াতধর্মী নয়। প্রত্যাবর্তন ব্যাকুল। সবাই বাড়ি ফিরছিল, তাদের পদক্ষেপ ত্রস্ত, সন্ত্রস্ত, নীরব। ব্যাপারটা কি প্রবীর বুঝতে পারে। হরতালের মিছিল-সূচী। কিন্তু ভীতি ছায়া এখানে এতো জমাট কেন সে আন্দাজ করতে পারে না। তার মনে পড়ে যায় বৈকালিক পত্রিকাগুলো শুধু কেনাই হয়েছে, খুঁটিয়ে পড়ে দেখা হয় নি। সুরেশের খবর বাদে। সে তখন দাঁড়িয়ে ছিল টেলিগ্রাফ অফিসের আওতায়। অফিস বিল্ডিং-এর বারান্দায় একটা থামের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে ওগুলোর এক-একটা করে খুলে সে হরতাল-সংবাদ পড়ে যেতে থাকে। হরতাল কুড়ি শতাংশের মতো সফল। কিন্তু সংঘর্ষ সংখ্যা অনেক। পুলিসের গুলিতে দুজন মানুষ মারাও গেছে। কিন্তু আহত সংখ্যা শতাধিক এবং তাতে পুলিসের ভাগ সামান্য নয়। মিছিল উপলক্ষে হরতাল-সূচীর সংঘর্ষ-প্রবণতা চরমে ওঠার সম্ভাবনা। কর্তৃপক্ষের সেটাই বিশ্বাস। তিনটে পত্রিকাই একথা জানাচ্ছে। তবে এদের মধ্যে যেটা বৈশিষ্ট্য-প্রয়াসী বেশী সেটা বলছে, পুলিস বন্দোবস্তের কড়াকড়ি যতই হোক না কেন, মিছিল উপলক্ষে রক্তক্ষয় অনিবার্য। হরতাল-সমর্থকরা অ্যাসেম্বলী হাউস পর্যন্ত মিছিল নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

পত্রিকাগুলো হিপ পকেটে গুঁজে রেখে প্রবীর আবার রাস্তায় নেমে আসে। এলেকাটা সুপ্রসিদ্ধ ফ্লোরা ফাউন্টেন। তখনকার দিনে সম-বিখ্যাত হর্ণবি রোড ট্রাম লাইন এবং অনেকগুলো বাস-রুট পিঠ বয়ে ক্রফোর্ড মার্কেট থেকে ভিক্টোরিয়া রেলওয়ে টার্মিনাস বাঁয়ে রেখে এসে জায়গাটাকে মাঝামাঝি চিরে চলে যায় দক্ষিণমুখী হয়ে কুলাবার দিকে। মিউজিয়ম, অ্যাসেম্বলী হাউস, গেট-ওয়ে ইত্যাদি ও বাঁ দিকে রেখে। টেলিগ্রাফ অফিস হর্ণবি রোডের ডান ধারে থাকে। ওধারেই হাইকোর্ট এবং ইউনিভার্সিটি। লাগোয়া, অ্যাসেম্বলীর দিকে যাবার পথে। কিন্তু এদিকটা ইমারত বহুল নয়। ইউনিভার্সিটির সুবিস্তীর্ণ পশ্চাৎপট এবং রেলিং-ঘেরা বাগান হওয়ায়। গণ্ডগোল বেধে গেলে আশ্রয় পাওয়া কঠিন। প্রবীর হর্ণবি রোড পার হয়ে চলে যায় বিপরীত দিকের ফুটপাতে।

কিন্তু প্রবীর বেশী দূর এগোতে পারে না। থমকে যায় সে এক আকাশ কাঁপানো শাব্দিক বিস্ফোরণ শুনে। ইউনিভার্সিটির সামনে বড় রাস্তাংশের মাঝখানে ছুটে এসে কে একজন লাল নিশান উঁচিয়ে ধরে চীৎকার করে "ইনকিলাব" সঙ্গে সঙ্গে "জিন্দাবাদ" প্রতিধ্বনি তুলে কয়েক শ' মানুষ নানা দিক থেকে দৌড়ে এসে একত্রে জড় হয়েই অ্যাসেম্বলী হাউসের দিকে

দৌড়তে আরম্ভ করে। কয়েক গজ পর্যন্ত এগিয়েও যায়। তারপরই বাধে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। লাউড-স্পীকারে বে-আইনী মিছিল স্বেচ্ছায় ভেঙ্গে দেবার আদেশ কয়েকবার জানিয়েই পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়ে মিছিলকারীদের উপর। হয় প্রত্যাক্রমণ। বেটনের বিরুদ্ধে ইট-পাটকেল, সোডা-ওয়াটারের বোতল। তিন-চার মিনিটব্যাপি এই সংঘর্ষে জয় হয় মিছিলকারীদের। কিছু রক্ত এবং কয়েকজন জখম হওয়া সহকর্মীদের পেছনে রেখে তারা আর এক দৌড়ে এগিয়ে যায় আরো কয়েক গজ। কিন্তু এবার এগিয়ে আসে পুলিসের বন্দুক-বাহিনী। এ সংঘর্ষে মিছিলকারীরা পালাতে আরম্ভ করে। বেশ কিছু রক্তক্ষয় হওয়ার পর।

কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘটে এক অবিশ্বাস্য বিক্রম-নাটিকা। এক স্বল্পকায়া কৃষ্ণাঙ্গিনী হঠাৎ মাথার উপরে এক রক্তপতাকা উঁচিয়ে ধরে এক দৌড়ে পৌঁছে যায় মিউজিয়মের কাছাকাছি পর্যন্ত। এত আচমকা যে পুলিস জবুথবু হয়ে থাকে। কিন্তু মাত্র কয়েক লহমার জন্যে। অচিরেই একজন সশস্ত্র পুলিস মেয়ে মানুষটিকে গুলি করে। পায়ে। মেয়েটি মুখে "ইনকিলাব" বুলিটি শেষ হবার আগেই "অ্যাঁ" বলে চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার গাঢ় নীল পেড়ে ধবধবে সাদা শাড়ীটা যায় রক্তে রাঙ্গিয়ে। দৃশ্যটা অনেকেই দেখছিল। রাস্তার পাশে বিল্ডিংগুলোর এটা বা ওটার কোন না কোন জানালা আধা ফাঁক করে করে। নীরবে, এক অবিশ্লেষণীয় আবেগে বিহ্বল হয়ে। কিন্তু মেয়েটিকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখে দর্শকমণ্ডলীর একজন গোঙিয়ে ওঠে। প্রবীর।

ঐ মেয়েটি ছিল স্মৃতি-নিকেতনের ভূতপূর্বা পরিচারিকা অম্বা!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিরু আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছে। স্মৃতি-নিকেতন আবার এক যৌবন উত্তাল দম্পতি নিলয়। কিন্তু ওখান থেকে সরে এসে প্রবীর গৃহ-কাতর। তার বয়েস ত্রিশের ওপর। গৃহজীবন বলতে কি বোঝায় সে এখনো- জানে না। স্মৃতি-নিকেতন বাসের স্মৃতিটুকু ছাড়া। ওখানকার দৈনন্দিনতার এমন একটা মোহ জন্মে গিয়েছিল যা ছিল তার কাছে গৃহ-সুখতুল্য। আত্মীয়তা-উষ্ণ পরিবেশে জীবন যে কত সুখকর তার একটা আন্দাজ সে ওখানে পেয়েছিল। বিশেষ করে যখন সে কানু প্রভা এবং সুরেশ একসঙ্গে থাকছিল। অম্বার তত্ত্বাবধানে।

নিজেকে আবার ভীষণ একা মনে হতে থাকে তার। যারা তাকে ঘিরে একটা আত্মীয়তা-উষ্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তাদের আর তার জগতের মাঝে একটা বৈষয়িকতা শীতল দূরত্ব জন্মে যাচ্ছিল। দ্রুত, আপনা-আপনি। কানু ব্যস্ত উকীল, সুরেশও এখন স্বনামধন্য ব্যারিস্টার, দুজনই উপার্জন-উন্মাদ। প্রভা এখনো আফ্রিকার প্রবাসী। প্রহেলিকা আবছা।

সে নিজেও লিপি-ক্ষিপ্ত। কোন প্রকার সাফল্য উৎসাহে নয়। ফলাফল নিরপেক্ষ লিপি উদ্যমে। উপন্যাস লেখা এখন তার প্রতিজ্ঞা উদ্দীপিত লিপিলক্ষ্য। যে দুটো উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে তাদের এখনো একটা ছাপা হতে বাকী। তবু সে আরো একটা লিখে যাচ্ছে। নিরালম্বে।

তবে প্রকাশন-প্রয়াস উপেক্ষিত রেখে নয়। ছাপা হয়নি উপন্যাসটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বিলেত। শোষিত মানব সমাজে যুদ্ধোত্তর মুক্তি বাসনার জোয়ার তখন প্রবল। তারই ঢেউয়ে ওখানে একটা নতুন প্রকাশন সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটা এখন ওটার কাছেই।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিকট অতীতের অনেক কথাই মনে পড়ে প্রবীরের। প্রভাকে প্রায়ই। ওর কথা মনে হলেই তার বুকটা দুমড়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় এক রাতে তার ঠোঁটে ওর চুমু খাওয়ার কথা। কতো নিখাদ সেই ইন্দ্রিয়-পুলকের স্মৃতি। ওতে কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। ছিল এক স্বেচ্ছাবন্দী হৃদয়ের আর্তি। সে রাত ওকে বুকে চেপে ধরলে কি হতো, সে জানে না। হয়তো ও আফ্রিকা নাও চলে যেতে পারতো। কেন সে রাত ওকে সে বুকে চেপে ধরেনি, এ প্রশ্ন সে নিজেকে প্রায়ই করে। কিন্তু কোন জবাব খুঁজে পায় না। হয়তো জবাব ভাল করে খোঁজেও দেখে না। একটা বিষাদ-গর্ভ উৎসর্গ তৃপ্তিতে মনটা কেমন যেন ভরে ওঠে।

ভাবে সে শিপ্রার কথাও। ও বোম্বেতেই আছে। কিন্তু তার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। ওর লেখা "খোঁপার ইতিহাসের" একটা রিভিউ সে লিখেছিল, কিন্তু ওটা ছাপানো হয়নি। তার আগেই "দ্যা এরিনা"তে তার লিপিসীমা সঙ্কুচিত করে দেওয়া হয়। না ছাপাতে পারা রিভিউটা সে ওর কাছে পাঠিয়ে দেয়। একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পত্র সহ। সেটার একটা প্রাপ্তি সংবাদও দেওয়া হয় না তাকে। দুজনের এখন আচমকাও দেখা হয় না। শিপ্রার এখন দ্রুত উন্নতির যুগ। এক মস্ত বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে সে এখন বিজ্ঞাপন সচিব। ওর সেই উন্নতি চিহ্ন একটা কোম্পানী-দত্ত বেবী অষ্টিন। মাঝে মাঝে প্রবীর গাড়িটাকে ছুটন্ত অবস্থায় এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় দেখতে পায়। পথিক-ঠাসা ফুটপাতের কোন না কোন অনাকর্ষণীয় ভাগ থেকে।

ইংরেজীতে লোকে বলে চোখের আড়াল হওয়া মানে মনের আড়াল হওয়া —অর্থাৎ বিস্মৃত হওয়া। শিপ্রার সঙ্গে নিঃসংস্রব যতই দীর্ঘায়িত হয় ওর স্মৃতি-মূর্তি প্রবীরের মনে ততই ঈপ্সা-তীব্র হয়। ব্যথা রেখায়।

অম্বার কথাও প্রবীর কখনো কখনো ভাবে। আশ্চর্য ওর জীবনের গতিমুখ। স্বাধীনতা উত্তর ভারতের জটিল হয়ে উঠা জাতীয় সংগ্রামের ও যেন এক প্রহেলিকা আচ্ছাদিত প্রতীক! নাসিক জেল-দাঙ্গার যে কজন বিপ্লবী বন্দী প্রাণ হারিয়েছিল তাদের একজন ছিল মারুতি বোরকর—অম্বার সেই প্রণয়ীটি।

মানুষটার নাম না জানা থাকায় প্রবীর সেটা গোড়ায় বুঝতে পারেনি। হরতালের দিন গুলি খেয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় অম্বা গ্রেফতার হয়। কার্যরত পুলিসের ওপর সশস্ত্র আক্রমণকারীদের একজন হওয়ার অভিযোগে তার বিচারও হয়। কানু তার ওকালতির দৌলতে ওকে খালাস পাইয়ে দেয়। ও এখন প্রভার মাসীর বাড়িতে কাজ করছে। যে ওকে বিপ্লব-আন্দোলনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সে মারুতি বোরকর প্রাণ দিয়ে গেছে দণ্ডাধীন দলীয় নীতির অনুসরণে। তার বিপ্লব বিশ্বাস যথেষ্ট বৈপ্লবিক ছিল । প্রায় সারা জীবনই দল এবং মজদুর স্বার্থে সে খেটে গিয়েছিল। মিলের চাকরী উৎসর্গিত করতে হওয়াতেও। কিন্তু পরে দেখা যায় তার দলের নীতিই ভুল ছিল। গোড়ায় অম্বা ও খবর জানতো না। সব কথা জেনে সে দিশেহারা। মারুতির আত্মবলিতে শোকাচ্ছন্ন তো সে ছিলই। পড়ে সে দারুণ অর্থাভাবেও। অচিরেই। তাই সে আবার চাকরী-নির্ভর। বস্তুতঃ তাকে প্রায় অনাহারেই থাকতে হয়েছিল কিছুদিন। কানুর কথায় নিরু তার দশা দেখে ঐ কাজটা পাইযে দেয়।

প্রবীরের নতুন বাসাটা খার শহরতলীরই দাণ্ডা নামক মেছো মহল্লার এক সমুদ্র ঘেঁষা জঙ্গলাটে কিনারায়। দ্রুত বর্ধিষ্ণু বাসা-প্রার্থীদের সমর্থন প্রত্যাশায় ওখানে একটা নতুন মহল্লা তৈরী করার চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু যাতায়াত এবং দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে আরো কতকগুলো অসুবিধা থাকায় ভাড়াটেরা ভিড় করে আসছিল না। ফলে ভাড়ার হার পড়ে যায়। সেলামী-টেলামীর ঝকমারী সৃষ্টি হবার প্রশ্নই ছিল না। প্রবীর ওখানে একটা এক কামরার ফ্ল্যাট নিয়েছে। বিল্ডিংটা ছোট্ট একটা টিলার ঢালুতে, সমুদ্রমুখো। নিরালায় থাকা এবং নির্বিঘ্নে কাজ করার পক্ষে জায়গাটা ভাড়ার অনুপাতে অতুলনীয়।

কাজ করেও সে প্রচুর। কিন্তু তার একটা অংশ ছিল অদ্ভুত। নিজের উপন্যাসটা ফেরি করে বেড়ানো।

বইটা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল। হয়নি বিক্রী। পঞ্চাশ-ষাট কপিও না। তাই সে নেমে গিয়েছিল এই অদ্ভুত অভিযানে। ভয়াবহ হচ্ছিল তার অভিজ্ঞতা। কিন্তু সে দমে যাচ্ছিল না।

একদিন সকালে সে যখন নিবিষ্ট মনে লেখায় ডুবে গিয়েছিল তখন কে একজন এসে তার দরজার কড়াটা শুধু নাড়েই না, নেড়ে যেতে থাকে। নীরব বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে প্রবীর দরজা খোলে উষ্মাবহ শক্তি প্রয়োগে। সঙ্গে সঙ্গেই সে

হয়ে যায় শিলায়িত আনন্দের স্থাপত্য মূর্তি। কড়া নাড়ছিল অম্বা আর ওর থেকে কয়েক পা দূরে দাঁড়ানো ছিল প্রভা। প্রবীরকে দরজা খুলেই থ হয়ে যেতে দেখে প্রভা খিলখিল করে হেসে ফেলে। চিনতে পারছ না?

কথা পরে। আগে ভেতরে এসো তো। ফিরলে কবে?

কাল বিকেলে। বাড়িখানা কিন্তু নিয়েছ চমৎকার। ঠিক যেন এক টুকরো মূর্ত কবিকল্পনা। তারপর, আমার ওপর রাগ করে আছ, না?

তোমার কি মনে হয়?

প্রভা কিছু বলতে পারার আগেই অম্বা বলে, জান প্রবীরভাই, কাল বিকেলে বিমান বন্দরেই প্রভাবেন আমার কাছে তোমার খোঁজ করেছিল।

তোকে ওকালতি করতে কে বলেছে? আচ্ছা দাঁড়া, আগে তোদের জন্যে একটু চা'র বন্দোবস্ত করে নিই।

কিন্তু সে তার এক কামরা ফ্ল্যাটের রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতেই অম্বা তার পথ আগলে দাঁড়ায়। তুমি যাচ্ছ কোথায়? সর, আমি সব করছি। অম্বা রান্নাঘরে চলে যায়।

তুই একা যাবি কেন? আমিও আসছি। প্রভাও ওঁর সঙ্গে চলে যায়।

হাসি ঠাট্টা মুখর এবং কার্যব্যস্ত মেয়েলী উপস্থিতিতে নিঃসঙ্গতা ম্লান এক-কামরা ফ্ল্যাটখানা হয়ে ওঠে এক পুলক প্রস্রবণ। প্রবীরের মনে পড়ে প্রভা এয়ারপোর্টেই তার খবর নিয়েছে এবং ফিরে আসার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ও তার দরিদ্র-নিবাসে ছুটে এসেছে। আমি নীচে থেকে কিছু খাবার-টাবার নিয়ে আসছি। পাশেই একটা পাঞ্জাবী হোটেল আছে। চমৎকার সিঙ্গাড়া-টিঙ্গাড়া করে ওরা।

বুক-ভরা পুলক নিয়ে প্রবীর দ্বিতলাস্থিত ফ্ল্যাট থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায় প্রায় নেচে নেচে। কিন্তু আঙ্গিনায় নেমে আসা মাত্রই তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। সামনেই এক বিরাট গাড়ি। এতে করেই যে প্রভা এসেছে তা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। ও বোম্বেতে ওর মেসোদের সেরা সেরা গাড়িতে চলাফেরা করে। কিন্তু এই গাড়িটার মালিক প্রভার মেসো নয়; সুরেশ। রাজনীতি ছেড়ে ব্যারিস্টারি করতে নামায় তার ধনকুবের পিতার তরফ থেকে ওটা পিতৃ-প্রসন্নতার প্রতীক হিসেবে দেওয়া হয়েছিল।

প্রভা এবং অম্বা চা খাওয়াটাকে একটা আনন্দমুখর ঘরোয়া উৎসব করে তোলে। কিন্তু এতো আগ্রহে কিনে-আনা খাবারগুলোর যা তার অংশে পড়েছিল

তার সামান্য কিছু খেয়েই রেকাবীটা সরিয়ে রেখে প্রভা বলে, আজ আমি কাজে বেরিয়েছি। সকাল সাতটা থেকে। সে তার ঘড়িটার দিকে চায়। প্রায় দশটা বাজে, এখনো অর্ধেক কাজই সারা হয়নি। অম্বা, দে তো অ্যাটাচে কেসটা।

প্রবীরের বুকটা আবার ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তার সঙ্গে দেখা করার ব্যাকুলতা থেকেই প্রভা ছুটে বেরয় নি। ও বেরিয়েছে চিঠি বিলি করতে। নিমন্ত্রণ চিঠি। কি উপলক্ষে, সুরেশের গাড়ি তারই প্রচারণ ডঙ্কা। শিল্প-খচিত মহার্ঘ লেফাফাটা খুলতে যায় প্রবীর। কিন্তু তাকে ওটা খুলতে দেয় না প্রভা। ওটা পরে দেখো। এখন আমার কথা শুন। আজ আমার ভীষণ তাড়াতাড়ি। আমি পরশুদিন আবার আসব। তোমাকে নিয়ে কিছু কেনাকাটা করতে বেরুব। তৈরী থেকো। দশটায়। এখন আসি।

প্রভার ব্যক্তিত্ব এখন আধুনিকতা সমৃদ্ধ। খুব চটপটেও। সুরেশের উপযুক্ত বাঞ্ছিতা। ধন্য ওর একনিষ্ঠ প্রেম। প্রবীরের সামনেই লেখার টেবিলটা। নিমন্ত্রণ চিঠিটা ওর-ই ওপর। অবসন্ন ঔৎসুক্যে হাত বাড়িয়ে সে ওটা ওঠায়। কিন্তু ওটা খুলেই সে চমকে ওঠে। বিয়ে প্রভার নয়, ওর এক মাসতুতো বোনের।

কিন্তু সুরেশের গাড়িতে প্রভাকে ঘুরে বেডাতে দেখার মর্মটাও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রবীর আবার বৈরাগ্য-ম্লান। এটা যে অহেতুক তা বুঝেও।

প্রভা কিন্তু পরদিন থেকেই প্রবীরের সাহচর্য-প্রত্যাশী। এক সঙ্গে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েও দেয়। যেমন আগে কাটাতো। তবে এবার প্রভা নিজের কথাই বলতে চায় বেশী। সে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসেছে মাসতুতো বোনের বিয়েতে নয়, সুরেশের ডাকে।

বিলেত পাঠানোর আগে সুরেশকে বিয়ে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গুজরাটে পেটেলরা পাতিদার নামক উপসম্প্রদায়। তাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা-অনুগত এবং আইন অনুমোদিত। কিন্তু সুরেশের পিতা পুত্রবধূর পক্ষ নিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে দেন না। রাগে, দুঃখে। এতো টাকা খরচ করে ব্যারিস্টার করানোর পর সুরেশ বিপ্লবী; যে মেয়ের সঙ্গে সে প্রেমে পড়েছে, সে দুর্নাম-গ্রস্তা। সুরেশ জেদ করলে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারতো। কিন্তু এ নিয়ে সে তার বাবার সঙ্গে লড়তে রাজী হয় না। স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিয়ে ভাঙ্গানোর প্রস্তাব ওঠানোর ফিকিরে থাকে। প্রভা পায় ফাঁকির গন্ধ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুরেশের

উপায়েই কাজ হাসিল হয়েছে। তাদের বিয়ে হবে শিগগীরই।

এদিকে প্রবীর তার উপন্যাসটা ফেরি করে বেড়াচ্ছিল। অপরাহ্নে অফিসে অফিসে। একদিন অশোক ত্রিবেদী নামে এক মস্ত কোম্পানীর কাঁচা বয়েসী বড় সাহেবের কাছে বই বিক্রী করতে যেয়ে সে দেখা পায় শিপ্রা সাতুস্করের।

অশোক ত্রিবেদী বোম্বেতে 'প্রগতি বন্ধু' বলে খ্যাত ছিলেন। সেই সূত্রে প্রবীরের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। চাপবাশীর ফাঁক করে ধরে রাখা দরজা দিয়ে তাকে ঢুকতে দেখেই সৌহার্দ্যবহ হাসিতে মুখ ভাসিয়ে অশোক ত্রিবেদী বলেন, এসো প্রবীর। ঘটনাচক্রে তোমার একজন ভূতপূর্ব সতীর্থও মজুদ।— শিপ্রার সঙ্গে প্রবীরের সহাস্য সম্ভাষণ বিনিময়। তারপর কি মনে করে? অশোক ত্রিবেদী বন্ধুত্বজাত অন্তরঙ্গতা ফুটিয়ে প্রবীরকে হাত বাড়িয়ে একটা আসন দেখান। কিন্তু যেই প্রবীর তার উদ্দেশ্যটা বলতে শুরু করে অমনি উনি তাকে থামিয়ে দেন। রুক্ষ স্বরে। আর শোনাতে হবে না। কে একজন আমাকে বলেছিল এ সম্বন্ধে। না, এতে আমার কোন সমর্থন বা সহানুভূতি নাই। সাহিত্যসেবা ভাল কথা, কিন্তু বক্তৃতাবাজি কেন? তাছাড়া যা তুমি বলে বেড়াও শুনছি তা আমি মানি না। স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ মন বলে কিছু নাই। মন এবং পরিবেশ পরস্পর নির্ভরশীল। তোমার মত একজন প্রগতিশীল সাংবাদিকের সে কথা জানা নাই ভাবতে আমার আশ্চর্য লাগে। যা হোক এ নিয়ে বিতর্ক বাধাতে আমার কোন ইচ্ছে নাই। আজকাল আর অ্যারিনাতে তোমার লেখা পড়ছি না। কি ব্যাপার?

ও কাজটা আমার চলে গেছে।

অন্য কোথাও চেষ্টা করছ? সাংবাদিক জগতে তো আজকাল চাকরীর ছড়াছড়ি। মাইনেও ভাল হচ্ছে।

সাংবাদিকতা আর ভাল লাগছে না।

ও! তুমি বেকার! আচ্ছা তাহলে তোমার একটা বই আমি কিনে নিচ্ছি। অশোক ত্রিবেদীর সুরে উদারমন্যতা।

মাপ করবেন, আমি এখানে বই বেচব না।

বেচবে না! তাহলে কেন মিছামিছি আমার সময় নষ্ট করতে এলে? অফিসে? এ অন্যায়। ত্রিবেদী সাহেবের সুর আবার রুক্ষ।

সরি। প্রবীর বেরিয়ে আসে, মাথা ঝাঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে। কিন্তু লিফ্‌টে শিপ্রাও এসে উপস্থিত। ওখানে তোমার কাজও সারা হয়ে গেল

নাকি? প্রবীর জিগ্যেস করে। শিপ্রা হ্যাঁ-না কি একটা জানিয়ে চুপ। প্রবীরও তাকে আর লক্ষ্য করে না। কিন্তু লিফ্‌ট থেকে নেমেই শিপ্রা বলে, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা বলার ছিল। সময় হবে?

প্রবীর চমকে যায়। আমি বেকার। আমার আবার সময়-অভাব কি?

শিপ্রা এখন একটা আবো বড় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন-সচীব। তার গাড়িও একটা নতুনতম মডেলের ফিয়াট। পথে নিজের অফিসে মিনিট কুড়ি কাটিয়ে এসে সে বলে, তুমি আজকাল থাকছ কোথায়? নিরু তো ফিরে এসেছে। প্রবীর তার বর্তমান ঠিকানা দেয়। শিপ্রা তাকে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যায় সেখানে। পথে এটা-সেটা বলে ভ্রমণ সময়টা উপভোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রবীরেব বাড়িতে যেয়েই সে বলে, তুমি এসব কি করছ?

কি সব?

সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে উপন্যাস লেখা, তোমার বই কেউ কিনছে না বলে সেগুলো নিজেই বিক্রী করতে লেগে যাওয়া, এ সবের কোন মানে হয়?

হোক বা না হোক, তাতে তোমার কি?

আমার কিছু না, কিন্তু পরিচিত কাউকে অপমানিত হতে দেখে কেউ চুপ করে থাকতে পারে?

এ ব্যাপারে আমি অপমান গা-সওয়া করে নিয়েছি।

কিন্তু কেন? এর চেয়ে চাকরি করা ভাল নয় কি?

ভাল মন্দ জ্ঞান তো সবার এক নয়?

জানি। কিন্তু সাধারণ জ্ঞান বলেও তো একটা জিনিষ আছে? সেটা তো সবার ক্ষেত্রেই এক?

হয়তো আমার সাধারণ জ্ঞান নেই।

এবার শিপ্রা রাগ করে। হ্যাঁ তুমি অসাধারণ। তাই অসাধারণত্ব জাহির করতে যেচে অপমানিত হয়ে বেড়াচ্ছ, না?

মুখে প্রবীর যাই বলে যাক শিপ্রার এই ব্যবহারে সে মনে মনে দরদ-সিক্ত হচ্ছিল। সে জবাব দেয়, তা নয়। আমার বিশ্বাস সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনীতিজাত একদেশদর্শিতা থেকে মনকে মুক্ত করার সময় এসেছে।

তুমি কে যে তুমি এ সমস্ত সমস্যা নিয়ে ভাবছ? তুমি কি ভাব, বল বা কর তা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাবে?

কেউ না। কিন্তু জীবনে বিশ্বাসেরও তো একটা স্থান আছে ?

তা আছে, কিন্তু যার পয়সার অভাব নাই, তার। তোমার উপার্জন-নির্ভর জীবন। বিশ্বাস ধুয়ে জল খেলে তোমার দিন যাবে ? না যে বিশ্বাসের বেদী দারিদ্র্য সেটাকে কেউ কোন মূল্য দেয় ? এ যুগে ?

কেন ? লেখেও কি অনেক মানুষ জীবিকা উপার্জন করছে না ? না, যে দরিদ্র সে লেখক হয় না ?

লেখকরাও উপার্জন করছেন। কিন্তু যাঁরা করছেন তাঁদের কেউই এক হাতে বিশ্বাসের ঝাণ্ডা অন্যহাতে কলম নিয়ে লিপিসংগ্রামী হয়ে উপন্যাস লিখতে যান না। যাঁরা দরিদ্র হয়েও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হন তাঁদের প্রেরণা-উৎস লিপি-কলা, কোন বিশ্বাস নয়।

প্রবীর এবার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। শিপ্রার চোখে চোখ রেখে সে একটু আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে বলে, তুমি আজ কেন এসেছ, শিপ্রা ?

শিপ্রা তার চোখ ফিরিয়ে নেয় না। তোমার কি মনে হয় ?

যা মনে হচ্ছে তা বিশ্বাস করতে ভরসা পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আচমকা আজ যদি অশোক ত্রিবেদীর অফিসে তোমার সঙ্গে দেখা নাও হয়ে যেত তবু তুমি আমার কাছে আসতে। অদূর ভবিষ্যতেই।

হ্যাঁ, কিছুদিন ধরেই আমি তোমার কাছে আসব ভাবছিলাম।

কেন ? প্রবীর শিপ্রার দুটো কাঁধ ধরে আবার ওর চোখে চোখ রাখে।

শিপ্রা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না। আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে, তাই। একটা প্রকাশন সংস্থা আরম্ভ করার।

প্রবীরের মনে হয় তাকে শিপ্রা আরো একবার তাসের ঘর মানে কি, বুঝিয়ে দিল। ওর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সে বলে, এ ধরণের একটা পরিকল্পনাতে আমার কি ভূমিকা থাকতে পারে ?

তোমার ভূমিকাই এতে আসল। যে পরিকল্পনাটা আমার মাথায় এসেছে সেটা বাস্তবায়িত করতে হলে কমের পক্ষেও দশ লাখ টাকার পুঁজি চাই। তবে তুমি চেষ্টা করলে এ টাকাটা যোগাড় করা কঠিন নয়।

যাকে মানুষ পেট চালানোর জন্যে নিজের লেখা উপন্যাস ফেরি করে বেড়াতে দেখছে তাকে দশ লাখ টাকার পুঁজি যোগাবার জন্যে কে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ?

তোমার তিন-তিনটি এমন বন্ধু আছে যাদের সহায়তা পেলে দশ লাখ কেন,

বিশ লাখ যোগাড় করাও কষ্টকর হবে না। কানু প্রভা আর সুরেশ। এদের একজনের শ্বশুর এবং দুজনের বাবা মহা-কোটিপতি। এদের তিনজনকে নিয়ে একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী করতে পারলে শহরে একটা সাড়াও পড়ে যাবে। সেটা হবে এই পরিকল্পনার আগাম বিজ্ঞাপন উৎসব।

আমি ওতে নেই। আমাকে মাপ কর।

শিপ্রা রাগ করে না। একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি? কেন তুমি 'অ্যারিনা' থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর আর কোথাও চাকরী খুঁজে নেওনি?

প্রবীর তার কারণগুলো সবিস্তারে বলে। শিপ্রা খুব নিবিষ্টমনে সব কথা শুনে নিয়ে বলে, তুমি অন্য চাকরী না খোঁজার যে কারণগুলো দেখালে সেগুলোর গুরুত্ব আছে। কিন্তু তুমি কাজ ছেড়ে দেওয়ায় সাংবাদিক জগতের কিছু বয়ে গেছে? এখন ভেবে দেখ, যদি সমাজের একজন কেউকেটা হয়ে এ সমস্ত কথা বলতে, তবে কি হতো। ছোট মুখে বড় কথা মানায় না।

আমি বড় না ছোট, আমি কেয়ার করি না। ওটা আমার বিশ্বাস, এবং যাতে আমার বিশ্বাস জন্মেছে তা আমি করব।

আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম? দরিদ্রের আবার বিশ্বাস অবিশ্বাস কি?

অন্য কথা বল।

শিপ্রা এবার রুষ্ট হয়। ভুলে যেও না, ওরকম একটা কোম্পানী গড়ে তোলা আমার অসাধ্য নয়। তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে সহায়ক করতে চাচ্ছি।

সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু ওতে আমি নেই।

তাহলে, যাও মরগে, না খেতে পেয়ে।

শিপ্রা চলে যায়। প্রবীর ভাবতে থাকে। ওর ব্যবহারে সে যতই আঘাত পাক বা আশ্চর্য হোক, শেষ পর্যন্ত ওর প্রতি তার মনোভাব যুক্তি-প্রশমিত হয়ে ওঠে। এখনো তাই হয়। ওর এই পরিকল্পনা উৎসাহের প্রশংসা না করে সে পারে না। ওতে সে দেখে ওর অদম্য অভিযান প্রীতি। কিন্তু তার পক্ষে ওর এই পরিকল্পনায় যোগ দেওয়া সম্ভব না। তার চেয়ে চাকরী করা শ্রেয়। জীবন-লক্ষ্য, কর্তব্য-তাড়না, সাফল্য-কল্পনা প্রভৃতির প্রশ্ন রয়েছে। তার আর ওর ক্ষেত্রে এ সমস্ত বিপরীত। ওর জীবন-দর্শন উপভোগ নির্ভর, তার— প্রবীরের চিন্তাধারা হঠাৎ থমকে যায়। মনে হয় তার জীবন দর্শন সে জানে না। যেমন সে আজও জানে না মানুষ-সত্তা বলতে তার বাবা-মা কি বুঝতেন। এভাবে সাংবাদিকতা ছেড়ে উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করার সত্যিই কি কোন সার্থকতা

আছে? শিপ্রা যা তাকে বলে গেল তার মধ্যে কি ভেবে দেখার মতো যথেষ্ট জিনিষ নেই? বেঁচে থাকতে গেলে সাধারণ জ্ঞান কখনো বিসর্জন দেওয়া যায়? যারা অসাধারণ তাঁদের কথা অবশ্য ভিন্ন। তাঁদের প্রতিভার আগুনে সাধারণ বুদ্ধি ছাই হয়ে যায়। 'তবু তাঁরাও কি দৈনন্দিনতার স্তরে সাধারণ বুদ্ধির উপরই নির্ভরশীল থাকেন না? তার কোন প্রতিভা নাই। সে জীবন-জিজ্ঞাসু। তবে?

প্রবীর ভাবতে থাকে তার নিজের কথা, আর যতই সে ভেবে যায় ততই একটা নতুন জিনিষ তার চোখে পড়তে থাকে। সাধারণত্বের সঙ্গে সংঘাত ঘটানোই যেন তার জীবন-স্রোতের স্বভাব। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তার জীবনে উল্লেখযোগ্য যাই ঘটেছে ছক ভাঙ্গানো হয়েছে। মনে পড়ে তার আশ্রয়হীন হয়ে কদমতলা থেকে চলে আসতে হওয়ার কথা। ক্লাস নাইন পর্যন্ত তার পড়া হয়েছিল। তবু সে আজ ইংরেজী লেখক হবার জন্য প্রয়াস-বন্দি। ও ভাষাতে স্বীকৃতিধন্য সাংবাদিকতা করার পর। এর পেছনেও ছিল কঠোর সাধনা এবং ঘটনা প্রবাহের অসাধারণত্ব।

কদমতলা থেকে বিতাড়িত হয়ে সে সাহায্যের জন্য যায় সুমিত্রা দত্ত-মজুমদারের কাছে। কিন্তু তিনি তখন আরো বয়স্ক, আরো দুর্দশাগ্রস্থ। নেত্রকোনায় তাঁর বাড়ীটা নিয়ে মেয়েদের মধ্যেও ঝগড়া বেঁধে গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর সময় ওটা যাঁর দখলে থাকবে তারই সুবিধা হবে বেশী। তাই একজন মেয়ে তাঁর দেখাশোনা করার ছলে সেখানে নিজেকে অধিষ্ঠিত করে নেয়। অন্যান্য মেয়েরা পরিস্থিতিটা বুঝে ফেলে। তাদের অধিকাংশই কি হয় দেখে যায়। কিন্তু দু-একজন এসে বাধায় ঝগড়া; বাড়ীতে অশান্তির একশেষ। ইতিমধ্যে সুমিত্রা সুন্দরী তাঁর বাড়ীতে এসে থাকতে আরম্ভ করেছিল মেয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে গিয়েছিলেন। অবস্থা, বয়েস এবং স্বাস্থ্যের কারণে। প্রবীরের জন্যে তিনি কি করতে পারতেন? তবু তিনি লুকিয়ে তার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দেন। সে চলে যায় কাশীতে। সে উচ্চশিক্ষালাভ আকাঙ্ক্ষী। ওটা একটা বাঙ্গালী-বহুল বিদ্যাকেন্দ্র। ওখানে থাকা-খাওয়া সস্তা।

ওখানে যেয়ে দেখে সবই সত্যি, কিন্তু তার তাতে তেমন কোন লাভ নাই। আরো পড়তে হলে যে ন্যূনতম সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন, তা তার নাই। বস্তুতঃ ওখানে যেয়ে পৌছনর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সে পড়ে দারুণ অভাবে।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে সে। শহরের সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই। যে

নেত্রকোনায় সে রোজ হেঁটে হেঁটে স্কুল করতো, তাও ঐ সময় একটা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল মাত্র। কাশীও তখন শহর ছিল না। তার কাছে বাঙ্গালী টুলা দেশই মনে হয়। সেখানে পূর্ববঙ্গের মানুষ প্রচুর। তবে অধিকাংশই বিধবা বুড়ি। তার বয়েস কচি, চেহারা ভদ্র এবং সুন্দর; কিন্তু গায়ে ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবী, পায়ে আধ-ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, চুল উস্কখুস্ক, মুখে ক্ষুধার তাড়না। ঐ যুগে প্রবাসে বেকার বাঙ্গালী ছেলের সুপরিচিত মূর্তি। দশাশ্বমেধ ঘাটে বিকেলে কোন কোন বাঙ্গালী বিধবা তাকে দেখে ব্যথিত হন, বিনা যাচ্ঞাতেই তাকে দুটো পয়সা দিতে যান। সে সবিনয়ে হাত গুটিয়ে বলে, আমাকে কোন কাজের সন্ধান বলে দিতে পারেন? আমি ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই জবাব এক :—না বাবা, কাজের খোঁজ তো জানি না।

কোন না কোন কাজ সে পেয়ে যায়। যেমন বাজার করে বাড়ির পথে আটকে-যাওয়া কোন মানুষের মোট বা তল্পিতল্পা গন্তব্য স্থানে বয়ে নিয়ে যাওয়া। এসব কাজ সে পায় আচমকা এবং আশ্চর্যজনক পরিস্থিতিতে। একদিন গোধূলিয়াতে সে এ ধরণের একটা মোট পায়। দরদাম ঠিক। কিন্তু যেই সে ওটা ঘাড়ে তুলতে যায় অমনি তার চেয়ে অনেক বেশী বয়স্ক একটা লোক তার হাত থেকে বোঝাটা ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে ওটার মালিককে বলে, চলুন, আমি নিয়ে আসছি। প্রবীর প্রতিবাদ করতে গেলে কুলিটা তাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

প্রবীর ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু একটু এগিয়ে যেতেই তার চেয়ে পাঁচ ছ বছরের বড় এক ছেলে তাকে থামিয়ে ঝরঝরে বাংলায় বলে, তুই বাঙ্গালীর ছেলে, না?

হ্যাঁ।

ওর ধমকে এমন কাঁচুমাচু হয়ে গিয়েছিলি কেন? মুখে মুখে জবাব দিয়ে বললি না কেন, রাস্তাটা কি কারো বাপের, না মোট বয়ে নেওয়ার জন্যে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে রাখা হয়েছে? কি?

প্রবীরের মুখে কথা নেই।

অপরিচিত বাঙ্গালী যুবকটি তাকে আবার বলে : দেখে মনে হচ্ছে তুই কোন পাড়াগেঁয়ে ভদ্রঘরের ছেলে। এখানে কেন?

এসেছিলাম।

বেড়াতে?

না।

পালিয়ে?

অযাচিত তার প্রতি মনযোগ দেখানোতে প্রবীর যুবকটির প্রতি একটা টান অনুভব করে। তার চোখ ছলছল করে। না। আমার বাড়িঘর নেই। আমি অনাথ। বলতে বলতে সে কেঁদেই ফেলে।

ও!

কথা বলতে বলতে তারা একটা চা'র দোকানে এসে বসে গিয়েছিল। অপরিচিত যুবকটি দু কাপ চা এবং দু প্লেট সিঙ্গাড়ার অর্ডার দেয়। প্রবীর পড়ে বিবেক-বিভ্রাটে। তার বর্তমান অবস্থায় পরের পয়সায় কেনা কোন কিছু খাওয়া মানে মুখ বাঁচিয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করা। নাস্তা করেই বেরিয়ে আসার অজুহাতে সে কিছু খায় না।

যুবকটিও পীড়াপীড়ি করে না। নিজে চা খেতে খেতে সে বলে, তুই বল্ছিস তুই অনাথ, তবে এমন দুধ-ঘি খাওয়া চেহারাটা বাগিয়েছিলি কেমন করে?

যুবকটির কথা কাটখোট্টা শোনাচ্ছিল। তবু ওর সান্নিধ্য প্রবীরের গৃহ-কাতর মন আশ্রয়-সুখের উষ্ণতা অনুভব করতে থাকে। সে কারো নামধাম প্রকাশ না করে রামতনুর অভিভাবকত্বে তার বাল্য বিবরণটা মোটামুটি জানায়। বিশেষ করে ম্যাট্রিক পাস না করতে পারার হতাশা ঘা-টা।

যুবকটি অনেকক্ষণ ধরে প্রবীরকে দেখে যায়। চুপ করে। তোকে আমি একটা কাজ পাইয়ে দিতে পারি। করবি?

প্রবীর উৎসাহ-ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, নিশ্চয় করব। কাজই তো আমি খুঁজছি।

কাজটা ছিল মামুলি। একজন নবীন বয়েসী অবাঙ্গালী অধ্যাপক বাড়িতে অনেক ব্যক্তিগত কাজ করতেন। তাঁর কাগজপত্র এবং নিজস্ব লাইব্রেরী গুছিয়ে রাখা। শহরে যে সমস্ত লাইব্রেরী আছে সেখান থেকেও তাঁকে বই এবং দলিলপত্র ধার করে আনতে হতো। সেগুলো এনে দেওয়া এবং ফিরিয়ে দিয়ে আসাও তার কাজ। কিন্তু কাজে বহাল হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই দেখা যায় তার কার্যতালিকা বেশ সম্প্রসারণধর্মী। অধ্যাপকটি ছিলেন অকৃতদার। খেতেন স্বপাক। পাকাশায়িক দৌর্বল্যহেতু। তাতেও প্রবীরকে কাজে লাগানো হতে থাকে। কারণ যে ঠিকে ঝি-টি ওখানে কাজ করতো সে প্রায়ই ঠিক সময়ে অনুপস্থিত থাকতে অভ্যস্থ ছিল। তবু ও কাজ পাওয়াটাকে প্রবীর একটা দৈব ঘটনা মনে করে। খাওয়া-থাকা

ছাড়া একটা মাসিক বেতনের বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়ায় নয়। ওখানে সে পায় সাধ মিটিয়ে পড়াশোনার প্রচুর সুযোগ। অচিরেই তার মেধা এবং পঠনপ্রীতির খোঁজ পেয়ে গিয়ে অধ্যাপকটিও তার প্রতি পাঠনউৎসাহী হয়ে তাকে শেখাতে লেগে যান। সে শিক্ষা বছর দুই চলতে থাকার পর প্রবীরের মনে জন্মায় প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রী যোগাড় করে যাবার স্বপ্ন। অধ্যাপকটি তাতে তাকে উৎসাহ দিয়ে যান। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁকে গ্রেফতার করে রাজবন্দী করা হয়। এক বে-আইনি বিপ্লবী দলের বড় নেতা হওয়ার সন্দেহে।

যে বাঙ্গালী যুবকটি প্রবীরকে ঐ কাজটি পাইয়ে দিয়েছিল তার নাম ছিল ভবতোষ মুখার্জী। এক গণ্যমান্য ধনী বাপের ছেলে ছিল সে। কিন্তু সে ছিল পাঠ-বিমুখ। বহু চেষ্টা করেও তাকে দিয়ে ক্লাস ফোর না ফাইভের বেশী পাশ করানো সম্ভব হয়নি। তার নেশা ছিল সঙ্গীত। তাতে সে অল্প বয়েস থেকেই কৃতবিদ্য হয়ে উঠতে থাকে এবং বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে একজন স্বীকৃতি-ধন্য শাস্ত্রীয় কণ্ঠশিল্পী হয়ে ওঠে। তার চরিত্র ছিল বিচিত্র। প্রবীরকে ঐ কাজটা পাইয়ে দেবার পর তার কথা সে একদম ভুলে যায়। আত্মীয়তা লুব্ধ প্রবীর তার সংস্রব থেকে সরে যায় না। কিন্তু সেটা বজায় রাখতে যেয়ে সে শুধু অবজ্ঞাত হয়। আসল কথা ছিল এই যে, ভবতোষ যে সমস্ত গুণকে সাহচর্য-সম্পদ মনে করতো, প্রবীরের মধ্যে সে সবের ছোঁয়াও ছিল না। কিন্তু অধ্যাপকটি ধরা পড়ে যাওয়ার পর সে নিজে থেকে প্রবীরের খোঁজ নিয়ে তাকে আরো একবার সাহায্য করে। 'অ্যারিনা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দেশ-বিখ্যাত। তাঁর এক বন্ধু এবং অবসরপ্রাপ্ত সহকর্মী যে কাশীবাসী ছিলেন, ভবতোষ জানতো। সে এঁর কাছ থেকে তাঁর নামে একটা সুপারিশ-পত্র যোগাড করে দেয় প্রবীরকে।

সেটা হয় স্রেফ একটা সুযোগ, সাংবাদিক হওয়ার পাকা সড়ক নয়। দেশে বেকার সমস্যা তখনো দারুণ। তার কোন ডিগ্রীও ছিল না। 'অ্যারিনায়' তাকে শিক্ষা-নবীশের কাজ কবতে হয় প্রায় তিন বছর। প্রথম বছরটায় বিনা মাইনেয়, পরের দুবছর নাম মাত্র মাইনেয়। বাঁচোয়ার জন্যে হেন নগণ্য কাজ নাই যা সে ঐ দু-তিনবছর ধরে করেনি। কখনো কারো কাচ্চা-বাচ্চা পড়ানো, কখনো রাত্রে কোন দোকানে হিসেব লিখে দেওয়া, খুচরো টাইপিং, ইত্যাদি বহুবিধ কাজ সে তখন করেছে। তবু তাকে তখন দু-একবার উপোষ থাকতে হয়েছে, ঘুমুতে হয়েছে পেড্‌মেন্টে। কিন্তু শিক্ষানবীশের কাজ সে ছাড়েনি, কারণ ওটা পাওয়া মাত্রই তার মন বলেছিলো, তার জন্যে এটাই প্রশস্ত জীবন-পথ।

তার সাংবাদিকতা তবু অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতো যদি বোম্বেতে তার নতুন হওয়া বন্ধু বৃন্দের একজন শরৎ পাওয়ার না হয়ে যেতো। শরৎ ছিল মারাঠী। তার মা বাবা দুজনেই ছিল মজদুর। ম্যাট্রিক পাশ করে সেও এটা সেটা করে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু তলে তলে সে ছিল এক বে-আইনী বিপ্লবী দলের সদস্য। তার চেষ্টায় প্রবীর বোম্বাই মিল-মজদুর সঙ্ঘের অফিসে রাত্রে উপরি কেরানীগিরি করার কাজ পেয়ে যায়। তাদের মজদুর পাড়ায় একটা আলাদা ঘর নিয়ে প্রবীরকে সে সেখানে সহ-অধিবাসী করে নেয় এবং তার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেয় নিজের বাড়িতে। কম খরচে। সেই ফরাসী মহিলার গেস্টহাউসে চলে না যাওয়া পর্যন্ত দুজনে একত্রেই থাকে। ওর সঙ্গে প্রবীরের কোন যোগাযোগ নাই এখন, যেমন নাই সেই অধ্যাপক এবং ভবতোষের সঙ্গেও।

প্রবীরের মনে হয় কে যেন ঘরে এসে ঢুকেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে যেয়েই সে সট্ করে দাঁড়িয়ে যায়। ঘরে শিপ্রা, তার মুখে অবিশ্বাস্য সম্প্রীতি-স্মিতি। কি ব্যাপার? প্রবীর জিগ্যেস করে।

কিছু না। এলাম। শিপ্রা বসে পড়ে। অনাহূত। আমার একটা কথা রাখবে?

কি?

বাংলাতেও উপন্যাস লিখতে আরম্ভ কর বা এ ধরণের অন্য কিছু একটা কর। যেমন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাংলা বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ।

তাতে কি হবে?

সাফল্য-সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। জীবনে তারো তো প্রয়োজন আছে?

তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমি লিখি কোন কিছুর আশায় নয়, বিশ্বাস তাড়নায়।

শিপ্রা বিরক্ত হয়। এ কথা কেন ভুলে যাচ্ছ যে, লিখতে হলে মনে যা থাকে তাতেই চলে না; পেটেও কিছু দিতে হয়?

এ কথাটা বলার জন্যেই তুমি ফিরে এসেছো?

সেটা কি আমার জন্যে যথেষ্ট কারণ হতে পারে না?

তা হতে পারে।

তবে?

প্রবীর চুপ করে থাকে। তার জবাবের জন্য একটুক্ষণ অপেক্ষায় থেকে শিপ্রা বলে, আমার চিন্তাশক্তি তত প্রখর নয়। তোমার তুলনায় আমার জ্ঞানও কম।

তবু আমি একথা কিছুতেই মানবো না যে জীবনে সাফল্য-বাঞ্ছার ভূমিকা গৌণ। আমার কি মনে হয় জান? তুমি একটা দারুণ হীনমন্যতা থেকে ভুগছো, এগিয়ে যাবার পথে সেটাই তোমার প্রধান অন্তরায়।

আমার এগিয়ে যাবার পক্ষে কি বাধা তা নিয়ে তুমি ভেবে সময় নষ্ট করছ কেন?

জানি না। তবে এ সম্বন্ধে ভাবাটা সময় নষ্ট করা মনে হয় না। আজকাল আমি এ সম্বন্ধে প্রায়ই ভাবি। জীবনে অনেক দেখা হয়েছে তো? বোধ হয় আমার মনেও একটা আত্ম-জিজ্ঞাসা জেগেছে বা জাগছে। কে জানে, হয়তো বা তোমারই প্রভাবে।

প্রবীরের মনে পড়ে শিপ্রাকে তার জন্ম-কাহিনী বলা হয়নি। ভুলে নয়, অবহেলাতে নয়, ঠিক মত প্রেরণার অভাবে। ব্যাপারটা কিভাবে ও নেবে অনুমান অতীত থাকায়। এখন তার প্রবল ইচ্ছে হয় সেটা বলতে। তবু শেষ-পর্যন্ত না বলাই থেকে যায়। বলাটা নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে বলে। সে শুধু জিগ্যেস করে, সেই জন্যেই কি ঐ পরিকল্পনাটা তোমার মাথায় এসেছিল?

না, তা নয়। ওটা আমার নিজস্ব সাফল্য-বাঞ্ছার ফল। জীবনে যা পাবার তা পেয়ে গেছি, তা আমার কোন দিন মনে হবে না। যেদিন তা মনে হবে সেদিন আমার মানসিক মৃত্যু হবে। তবে একথাও ঠিক যে তোমার সঙ্গে একটা অভঙ্গুর যোগসূত্র স্থাপনের বাসনাও আমার মনে জেগেছে। উপন্যাসটা পড়ার পর আমার মনে হতে থাকে ওতে তোমার এমন একটা সাধনা-শক্তির পরিচয় আছে যা মানুষকে অভিভূত করে। নিজস্ব একটা সংস্থা স্থাপনের জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ওটা আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু করবই। কিন্তু তোমার উপন্যাসটা পড়ার পর এই পরিকল্পনায় তোমাকে সহকর্মী করার ইচ্ছে জন্মায়। কারণ ওটা পড়ার পর থেকে আমার মনে হতে থাকে, আমার মধ্যে সাফল্য তাড়না আছে, নাই যথাযথ সার্থকতা বোধ। জীবনে যা পাবার তা আমি পেয়ে গেছি তা আমার কখনো মনে হোক, এটা যেমন আমি চাই না; তেমনি যা পাচ্ছি তার বৃহত্তর কোন সার্থকতা থাকবে না তাও আর আমি ভাবতে পারি না, ভাবতে চাই না। এখানেই তোমার জয়, আমার পরাজয়। তাই তোমার দোরে আমার ধর্না।

প্রবীর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, বাংলাতেও লেখা বা এ ধরণের অন্য কিছু একটা করার প্রয়োজন আমার নিজেরও মনে হয়েছে অনেকবার। হয়তো

ইতিমধ্যে কিছু একটা করেও ফেলতাম। কিন্তু আমি উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেছি একটা বিশ্বাস তাড়নায়। এ লেখার মাধ্যম ইংরেজী সে জন্যেই। ঐতিহাসিক কারণে আমাদের দেশে ইংরেজীর ভূমিকায় কল্যাণকর জাতীয়তা জন্মে যাওয়ার ফলেই আমরা আজ একটা জাতি। এবং এটা হবে বুঝতে পেরেছিলে বলেই রামমোহন আমাদের জাতিত্বের আদি স্রষ্টা। সেটা ভুলো না।

কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ, প্রবীর। আমাদের দেশের ইংরেজী জানা মানুষদের গোত্র দুটি। রামমোহন এবং মেকলে। পূর্বোক্ত গোত্রীয়দের ভূমিকা মুখ্য ছিল স্বাধীনতার আগে। তাঁদের স্থান এখন কেড়ে নিয়েছে পশ্চাদোক্ত গোত্রীয়েরা। এদের আমলে ইংরেজীতে উপন্যাস লিখতে হলে তোমাকে জন মাস্টার বা ওঁর স্তরের লেখকদের মতো লিখতে হবে। তোমার ইংরেজী যদি ইংরেজ যেমন ইংরেজী লেখে তেমন হয় তবেই তোমার লেখা ইংরেজী বই এখন পড়া হবে। তাতে যদি আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম কেন, সভ্যতাকেও হেয় করে দেখাও কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু মনে কর না, আমাদের নতুন জন্মাজাতি-সত্বাকে চিত্রায়িত করেছ বলে তোমার উপন্যাস ঘরে ঘরে পড়া হবে। ককৃখনো না। আচ্ছা, আমি এবার যাব। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তুমিও সঙ্গে চল না। আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসা হবে। গাড়ি সঙ্গে আছে। যাবার পথে একটু জুহু পর্যন্তও ঘুরে আসা যাবে।

প্রবীর আবেগ-সিক্ত ঔৎসুক্যে শিপ্রাকে দেখতে থাকে। বলে, চল।

তারা যায় জুহুতেই। আলাপ-আলোচনাও হয় বিস্তর। কিন্তু বালুচরে বসে নয়। এক সুপরিচিত মারাঠী পরিবারের বাসভবনে। সেলামরত অস্ত্রধারী দরওয়ানের সবিনয়ে খুলে দেওয়া ফটক দিয়ে শিপ্রাকে গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ির সুবিন্যস্ত চত্বরে ঢুকতে দেখে প্রবীর আশ্চর্য। এখানে যে? এটা তো দেওধার ভবন?

দেখি, একনাথ আছে কিনা।

রণ-উল্লাসী মারাঠীদের মধ্যে যে কয়েকটি ঘর লক্ষ্মী-পূজক হয়ে গিয়ে বোম্বের শিল্প এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তাদের একটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিষ্ণু দেওধার। তিনি এখন প্রবীণ বয়স্ক। একনাথ তাঁর দুই পুত্রের দ্বিতীয়টি, দেওধার অ্যাণ্ড সানসের বড় বড় কল-কারখানা এবং বাণিজ্যিক সংস্থার তিনিই সর্বেসর্বা। অবশ্য অবসরপ্রাপ্ত পিতার আজ্ঞাধীন।

একনাথ দেওধারের বাড়িতে থাকা সম্পর্কে শিপ্রার মন্তব্যে যে অনিশ্চয়তার আভাষ ভেসে উঠেছিল, সেটা কিন্তু স্রেফ একটা বাককৌশল প্রমাণিত হয়। চত্তরে গাড়ি এসে ঢোকার শব্দ শুনেই যিনি খোলা দরজা দিয়ে ত্বরান্বিত পদক্ষেপে বেরিয়ে আসেন তিনি স্বয়ং একনাথ। তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় না থাকলেও তাঁকে চিনতে পারা প্রবীরের পক্ষে মুশকিল হয় না। ক্রীড়া জগতের একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় তাঁকে খেলার মাঠে প্রায়ই দেখা যেতো। সংবাদিকতার গোড়ার দিকে প্রবীর তাঁকে সামনা-সামনিও দেখেছিল অনেকবার। তাছাড়া ইদানীং সংবাদপত্রে তাঁর ছবিও দেখা যাচ্ছিল।

একনাথ শুধু বেরিয়ে আসেন না। ক্ষিপ্রগতিতে আঙ্গিনায় নেমে গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বলেন, এতো দেরী যে? আমি তো...... ও, তুমি আজ সবান্ধব?

শিপ্রার সঙ্গে এবার ড্রাইভার ছিল। সে ইতিমধ্যে গাড়ি পার্ক করে ফেলেছিল। একনাথ কর্তৃক খুলে-ধরা দরজা দিয়ে নামতে নামতে শিপ্রা জবাব দেয়, আমার বন্ধুটি তোমার কাছে ঘনিষ্টতম ভাবে পরিচিত। প্রবীর পুরকায়স্থ।

"ওঃ—হো" উচ্চারণের এক কেতাসুন্দর ধ্বনি তুলে একনাথ গাড়ির ওপর দিকে ছুটে চলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ড্রাইভার সসম্ভ্রমে নেমে এসে ওদিকের দরজা খুলে ধরেছিল। প্রবীরও বেরিয়ে এসে একনাথের দিকে সোৎসাহে অগ্রসর হতে হতে বলে, আপনার সঙ্গে কিন্তু আমার বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। খেলার মাঠে এবং খেলাধূলা সম্পর্কে প্রেস কনফারেন্সে। দুজন তখন মুখোমুখি, সাগ্রহে এবং সহাস্যে করমর্দনরত —বিশেষ করে চল্লিশ দশকের গোড়ায় সেই সর্ব-ভারতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে।

একনাথ ততক্ষণ তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। উপস্থিত উপলক্ষে করমর্দন স্বাগত সম্ভাষণের পক্ষে যথেষ্ট আগ্রহ-উষ্ণ কেতা-প্রকরণ মনে না হওয়ায়। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কিন্তু আরো ঘনিষ্ট। আপনার উপন্যাসের দৌলতে।

শিপ্রাও ইতিমধ্যে পারস্পারিক পরিচয় স্বীকৃতির এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। স্মিতাননা। সে প্রবীরকে লক্ষ্য করে বলে, এখন বুঝতে পারছ কেন তোমাকে এখানে ধরে নিয়ে এলাম?

একনাথ কৃত্রিম রোষে মুখ কালো করে শিপ্রাকে ফট্ করে বলেন, তুমি থাম। এঁকে আমার সঙ্গে পরিচিত করে দেবার জন্যে তোমাকে

কতবার বলা হয়েছে ভুলে যেও না।

দেওধার ভবনে প্রবীর খুবই আপ্যায়িত হয়। ঘরোয়া স্তরে। একনাথের আগ্রহে দুজন একজন আর একজনকে নাম ধরে সম্বোধন করতেও আরম্ভ করে। কিন্তু এক ফাঁকে একনাথ প্রবীরকে বলেন, তোমার উপন্যাসটাতে একটা জিনিষ হৃদয়গ্রাহী অভিনবত্ব ফুটিয়েছে। আমাদের জাতীয় সংগ্রাম এমন সুন্দর ভাবে চিত্রায়িত হতে আর কোন উপন্যাসে দেখিনি। কিন্তু গান্ধীজীকে বিপ্লব যুগের যীশু বলতে গেলে কেন? তাঁকে যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে তুলনা করা যায় নিশ্চয়ই। কিন্তু বিপ্লবের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক? হাত-পা ধরে কিম্বা দান খয়রাতের মাধ্যমে সমাজ বিপ্লব ঘটানো কখনো সম্ভব? রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে বিপ্লব, সৈন্যদলকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র, মালিকানা বাদ জমির বণ্টন, দান খয়রাতের মাধ্যমে সম্পত্তি সমকরণ ইত্যাদি রামরাজ্যিক কল্পনা এখন শুধু সুখ স্বপ্ন। রামের যুগ কবে চলে গেছে। তাঁর রাজ্য বা রাজ্যিক বৈশিষ্ট্য মানুষের অতীত-পটকে নান্দনিকত্ব সমৃদ্ধ করার উপকরণ যোগাতে পারে। কিন্তু আমরা এসে গেছি কলিযুগে। ত্রেতাযুগের মহিমায় আর যাই থেকে থাক বিপ্লব চিন্তার বীজ আছে মনে করা বাতুলতা মাত্র।

প্রবীর চট্ করে জবাব দিতে চায় না। একনাথ দেওধার যে স্রেফ একজন দক্ষ সম্পত্তি সঞ্চালকই নন, একজন চিন্তা-নিপুণ এবং পাণ্ডিত্য সমর্থিত আলোচনা-বিশারদও, সে পরিচয় ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যুৎসই জবাবটা মনে মনে গুছিয়ে নিতে পারার আগেই টেলিফোনে একনাথের ডাক পড়ে। শিপ্রাকে তার আগেই চলে যেতে হয়েছিল অন্দর মহলে। মেয়েদের সঙ্গে আলাদা আসর জমাতে। প্রবীর একা পড়ে যেয়ে খুশী। তার উপন্যাসে গান্ধীজীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার বক্তব্যটা থেকে গেছে অস্পষ্ট। তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্তা যথেষ্ট পরিমাণে গবেষণা আলোকিত কিম্বা বিশ্লেষণ-নির্ভর না হওয়ায়।

গান্ধীজীর অস্তিত্ব তার সংবিতে প্রথম অনুপ্রবেশ করে তার বাল্যকালে একবার এক হোলি উৎসবের মাধ্যমে। সমৃদ্ধ গ্রাম কদমতলায় উৎসবটা পালন করা হতো মহা ধুমধামে। পার্বণ উৎসাহে রতি-রসেরও বর্ণিলতা ফুটতো। গ্রামের পাশেই বাজার। ওখানে টাটিতে ঘেরা একটা ছোট্ট জায়গায় যারা থাকতো তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হওয়া ভদ্র পরিবারের ছেলে-ছোকরাদের

ক্ষেত্রে নষ্ট চরিত্রের পরিচয় হতো। কিন্তু ঐ পর্ব উপলক্ষে ভদ্রপাড়ার বড়দের অনেকেই ওখানে জমা হতেন। হোলি গান গাইতে ওখানে যাওয়ার প্রয়োজনটা পার্বণিক কি না, তন্নিয়ে দেখার প্রবণতাটা ঢাকা থাকতো পারম্পরিকতা স্পষ্ট অস্পষ্টতায়। তবে অন্দর মহলে এ নিয়ে বিরক্তি-তেতো, উৎকণ্ঠা আশ্রিত বা রোষতপ্ত জল্পনা কল্পনা হতো চাপা গলায়, সাঙ্কেতিক ভাষায়, যদিও বুঝবার বয়েসের ছোটদের কাছে কিছুই অস্পষ্ট থাকতো না। ওদিকে সুরা সেবনটা হতো পাড়াতেই, খোলাখুলি। কিন্তু সে বছর এসব একদম বাতিল হয়ে যায়। হোলি গানে ভেসে ওঠে স্বাদেশিকতা। আর স্বাদেশিকতা-সিক্ত হোলি গানের একটাতে প্রবীর গান্ধীজীর নাম উচ্চারিত হতে শুনে সর্বপ্রথম। তার বয়েস হবে তখন সাত কি আট। কিন্তু ঐ গানটার একটা কলি তার মনে থাকে সারাজীবন।

যুগে যুগে কর্মের ফেরে
দেশে অত্যাচার
কলির জীবে উদ্ধারিতে
গান্ধী অবতার…

এক প্রায়-নিরক্ষর গীতকারের তাৎক্ষণিক রচনা। তবু এর মধ্যে প্রবীরের দুঃখ নির্যাতিত মন এক অজানা সান্ত্বনার সাড়া অনুভব করে।

ও উপলক্ষে ঐ গীতিকারের আরো অনেক তাৎক্ষণিক রচনা গাওয়া হয়েছিল। তবে তার মনে আছে স্রেফ আর একটা মাত্র রচনার খানিকটা :

মায়ের ডাকে সাড়া দে-রে ভাই।
দেখ চিত্তরঞ্জন দাশ ত্রিশ হাজার টাকা মাস
সেই উপার্জন ছেড়ে তিনি ধরেছেন সন্ন্যাস।
দেশের উকিল-মোক্তার মুন্সেফ ডাক্তার
তোরা এখনো জাগলি না ভাই॥

গানটা ছিল বড়। ওটারও বাকি অংশটা তার মনে নাই। কিন্তু ওটার শেষাংশটা সে ভুলতে পারেনি কখনো। হয়তো ওতে ঐ প্রায়-নিরক্ষর কবির নামটা উল্লেখ হওয়াতে।

কয় কাঙ্গাল জগতে জয় পতাকা ভারতে
নিশ্চয়ই উড়িবে দেরী নাই॥

ঐ প্রায়-নিরক্ষর কবি নিজে খুব ভাল গাইতে পারতেন। ছিলেন বেশ

ব্যক্তিত্ব-প্রভ এবং লোকপ্রিয়। তাছাড়া তিনি সমৃদ্ধ পুরকায়স্থদের একজন ছিলেন। ফলে গায়ক এবং গীতিকার হিসেবে উনি ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ওঁর সুরে এবং গায়ন-ভঙ্গীতে এমন একটা যাদুকরী আবেদন থাকতো যা শ্রোতাদের অভিভূত করে ফেলতো। কিন্তু ঐ হোলি উৎসবে ওঁর স্বরচিত গান গাওয়ার স্মৃতি প্রবীরের মনে চিরস্থায়ী হয়ে যাবার সেটা ছিল গৌণ কারণ। আসল কারণটা ছিল সেখানে গান্ধীজীর স্বাদেশিকতা-আশ্রিত আবেগ-উপস্থিতি। প্রবীণ বয়েসে দেবপ্রসাদের মদ খাওয়া ছেড়ে লাঠি-খাওয়া জেল-যাওয়া দেশসেবক হবার কাহিনীও তার বালক মনে গান্ধী-চেতনায় নতুন গভীরতা জাগায়। তখন থেকেই সে গান্ধীজী সম্বন্ধে ভাবা এবং সুযোগ পেলেই তাঁর লেখা কিম্বা বক্তৃতাদি মন দিয়ে পড়া তার এক অপ্রচারিত অভ্যেস হয়ে যায়। কিন্তু গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ভূমিকার বৈপ্লবিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয় সে তার উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রভার মতামত জানার পর। তখন থেকে সে এ সম্বন্ধে অনেক ভেবেছে, কিন্তু কোন প্রকার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নি।

টেলিফোনে কথা বলা শেষ করে একনাথ ফিরে আসেন মিনিট তিন-চারেকের মধ্যে। প্রবীর বলে, তুমি যে মনোভাব থেকে পরিস্থিতিটা দেখছ তার একটা আভাষ আমাদের একজন স্বনামধন্য বাঙ্গালী লেখকের বইয়ে-টইয়ে প্রায়ই দেখি। তিনি ইংরেজীতেও লেখেন। তাছাড়া আমাদের আমলাতন্ত্রে তাঁর স্থান কর্ণধার পর্যায়ে। তুমি হয়তো তাঁর লেখারই প্রতিধ্বনি করছ। কিন্তু এতে কি অতীত-বিলাসের ছোঁয়া নাই? এই মনোভাবের মনীষীদের সমীক্ষণ-বস্তু হলো, 'সংবিধান-অনুরাগ বনাম ফরাসী এবং রুশী বিপ্লব।' আমার কাছে ঐ তিনটে সমাজ কাঠামো শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রসূই নয়। নতুন সমাজ নির্মাণের সামগ্রী ভাণ্ডার। গান্ধীজী হলেন ঐ সৃষ্টি-হতে-বাকি সমাজের আদি বিশ্বকর্মা। সব বিশ্বকর্মাই সমগোত্রীয় নয়। এঁদের কেউ কেউ যা আছে তার অনুকরণ কিম্বা শ্রীবৃদ্ধি করেন। কেউ কেউ গড়ে তোলেন যা হতে যাচ্ছে তার ভিৎ কিম্বা কল্পনা-কাঠামো। গান্ধীজী এই দ্বিতীয় স্তরের বিশ্বকর্মা। তাই তিনি বিপ্লবী।

এই বিতর্ক চলে অনেক রাত পর্যন্ত। আলোচনা মঞ্চ দেওধার ভবন থেকে শিপ্রাদের বাড়িতে স্থানান্তরিত হতে হওয়াতেও। গোড়াতেই এক সময় শিপ্রা জানিয়ে রেখেছিল যে এই সান্ধ্য মিলন ত্রিপাক্ষিক হওয়ার কারণ তার বাড়িতে আয়োজিত এক খামখেয়ালী নৈশ ভোজন। সেই উদ্দেশ্যেই একনাথের বাড়ীতে আসার পথে সে প্রবীরকে ধরে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ভোজন আসরেও

পাত্রী-আলোচনা গুরুত্বাধিক থেকে যায়। শিপ্রার মা-বাবা দুজনেই অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। তার ভাই দুজনের একজনও শিক্ষাবিদ নয়, কিন্তু দুজনেই উচ্চশিক্ষিত এবং বিতর্ক-বিশারদ। সবাই এই আলোচনায় যোগ দেন। সেটা প্রবীরের তরফে অত্যন্ত শ্লাঘনীয় হয়। কারণ এর প্রসঙ্গমূল থেকে যায় তার উপন্যাস। সেটা যে সাতুস্কর পরিবারের সবাই পড়েছিল, তা জানা হয়ে গিয়েছিল ভোজন মিলনের প্রারম্ভেই। তখন এটাও বোঝা গিয়েছিল যে ওটা পড়ে সবাই গুরুত্ব-মুগ্ধ, যদিও এর বক্তব্য সম্পর্কে প্রত্যেকের মত ভিন্ন ভিন্ন। প্রবীর তাতে অত্যন্ত উৎসাহিত। বস্তুতঃ এমন শ্লাঘা-সুখ সে জীবনে আর কখনো অনুভব করেন নি। তবু তার মনের এক নিগূঢ় তলায় সে অনবরত ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল। কারণ আলোচনার এক স্তর থেকেই সে এক হৃদয়বিদারক অনিশ্চয়তার আভাষ পেয়ে গিয়েছিল। তার মনে হতে থাকে একনাথ দেওধার যেন শিপ্রার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত-পানিপ্রার্থী।